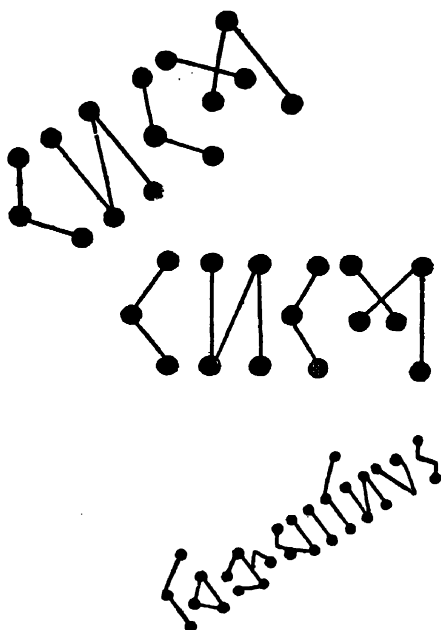


বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২



প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৬০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১ কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

বেঞ্জামিন গাই হর্নিম্যান

মহাত্মা গান্ধীর ভাষায়

"The man who taught us the 'Mantras of Liberty'."

তাঁর পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

কাহিনীর ভূমিকাতেই বলে রাখা প্রয়োজন যে এই কাহিনী ঠিক গান্ধীজির জীবনী বা গান্ধী ক্যাম্পের ইতিহাস নয়। কতোগুলো বিক্ষিপ্ত ঘটনা,—প্রেস রিপোর্টার হিসেবে দৈনন্দিন খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে এগুলি সংকলণ করেছিলাম, যাদের বহু অংশ বহু দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনায় রিপোর্টারের দৃষ্টিভঙ্গী এড়াতে পারিনি। সেই কারণ বশতঃ কাহিনীর কয়েকটি অংশ সাহিত্যের রস-মাধুর্য থেকে বঞ্চিত। অতএব পাঠকদের মনে হয়তো বিরক্তি আসা অসম্ভব নয়। তবে যথাসাধ্য সেই বিরক্তি উৎপাদনের প্রারম্ভেই কাহিনীর ছেদ টানার চেষ্টা করেছি।

আর একটা কথা। রচনার সময় কাল উনিশ-শো পঞ্চাশ। তিনবৎসর পরে "মাসিক বসুমতী"তে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। এ রচনা বের হ'বার পর কয়েকটি সংবদপত্রে এর তীব্র সমালোচনা হয়। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে আমি ভেজাল খাঁটী বলে চালাবার চেষ্টা করেছি।

এ অভিযোগ সত্য নয়। কারণ এই কাহিনীর অধিকাংশই ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এবং বহু সংবাদপত্র ও গ্রন্থের সাহায্যে এ কাহিনী রচনা করা হয়েছে। কেননা ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত করার মতো স্পর্ধা আমার নেই।

আর একদল মন্তব্য করেছেন যে কোন একটি বাংলা বইয়ের অনুকরণে এ কাহিনী লেখা হয়েছে। অনুকরণে সাহিত্য-সৃষ্টি হতে পারে, সংবাদপত্রের রিপোর্ট রচনা হয় না। যা দেখেছি তাই এখানে লিখেছি।

আমার এক সমালোচক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন যে এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে একটী মেয়ের জীবন কাহিনীকে জড়িত করা কী প্রয়োজন।

এই কাহিনীর নায়িকার সঙ্গে আমার গান্ধী ক্যাম্পেই বহুবার দেখা হয়েছে। গান্ধী ক্যাম্পের টুকরো খবর সংকলন করতে গিয়ে তার কথা আমার বারবার মনে হয়েছে। হয়তো এ মেয়েটির কথা উল্লেখ না করলে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। আর, তার কাহিনী যদি কেউ বিশ্বাস না করেন তবে সমালোচনার দ্বার তো খোলাই রইলো। এতদিন রিপোর্টার হিসেবে পরনিন্দা রিপোর্ট করে এসেছি, এবার আত্মনিন্দা শোনার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এ বই লিখলাম।

লেখায় যথেষ্ট প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন বসুমতীর সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। শুধু তাই নয়, গ্রন্থ প্রকাশনেও তিনি বিশেষ সাহায্য করেছেন। এর জন্যে তাঁর কাছে আমি বিশেষ ঋণী। তা ছাড়া আরো কয়েকজনের সাহায্য আমি এই লেখাতে পেয়েছি। বিশেষ করে শ্রীযুক্তা অনিতা সেনের কাছ থেকে। শ্রীচঞ্চল সরকার, শ্রীসন্তোষ বাগচী ও আমার আরও কয়েকজন সহকর্মী আমাকে তাঁদের সমালোচনা ও পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন।

কাম্বালা হিল, বোম্বাই

BGXO.
EXVIKRAMADITYA
TO PRESS LONDON
COLLECT

(Gandhi Camp One)

40000 fstp Calcuttas fstp Calcutta celebrated Independence Day with an abandon not witnessed here for aye longtime fstp Seldom city been so jubilant or so full of people fstp For first time since last years communal riotings city ceased to be place of fear fstp Unexpected fraternization between Hindus and Muslims which was seen last night continued throughout day fstp Members of both community tore past in lorries shouting slogans Fstp Europeans and other foreign nationals also took

part in celebration fstp European business houses and homes flew both Union Jacks and National flags fstp para Earlier Mahatma Gandhi accompanied by SSSHHH Suhrawardy toured Calcutta to see *how city celebrating* Independence Day fstp As his car came Entally area he was recognized by some people and immediately hundreds of Muslims circled round him and shouted Gandhiji kijai fstp Later he drove to Maidan fstp In evening Gandhiji postprayer broke his twentyfour hour fast which he had started yesterevening in observance of Independence Day fstp bracket More unbracket.

রাত্রি বারেটা। দূর থেকে কেল্লার তোপধ্বনি ভেসে এলো। 'আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো শঙ্খধ্বনিতে।'

পনেরোই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ। আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ক'লকাতায়। চারিদিক লোকে-লোকারণ্য। হৈ-হট্টগোল সব মিলে এক বিরাট ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি শহরের এক প্রান্তে। বেলেঘাটা, গান্ধীজির আশ্রমে। উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে উন্মত্ত জনতা এসে এখানে করেনি কোন হৈ-হল্লার সৃষ্টি।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। সংবাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি আশ্রমের আঙ্গিনায়। নির্মলবাবু নেই, বাড়ি চলে গেছেন। শুধু যাবার আগে নিরাশ করে গেছেন। বলেছেন, 'ভায়া, দেবার মত কিছু নেই।'

সারা দুপুর-বিকাল তাগিদ এসেছে নিউজ-এডিটরের। লণ্ডনের 'কেবলের' জন্যে চাই রং ফলানো বর্ণনা। আজ স্বাধীনতার প্রথম দিবস, গান্ধী আশ্রম সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে। কী করে গান্ধীজি বরণ করে নিয়েছেন দেশের মুক্তিকে। কিন্তু দেখতে পেয়েছি গান্ধীজির ঔদাসীন্য। জাতির মুক্তিতে তিনি যেন উচ্ছ্বসিত হননি বরং পেয়েছেন অন্তরে ব্যথা। স্বাধীনতা এনেছে শোক, এনেছে গৃহ বিবাদ। তাই তিনি আজ উপোষ করেছেন।

দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দেখেছি সাংবাদিকের দৃষ্টিতে। যখন লড়াই খতম হলো তখন দেখতে পেলাম যুদ্ধে বিজয়ী

হয়েও কূটবুদ্ধিতে হয়েছি পরাজিত, তাই বণিক সম্রাটের ঘোষণা যেদিন শুনতে পেলাম সেদিন শুধু মাত্র বিস্মিত হইনি, বিচলিতও হয়েছিলাম।

বহুদিনের পুরানো স্মৃতি মনে এলো। ১৯৪০ সাল। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে আস্তানা গেড়েছি বোম্বেতে, সাংবাদিক হ'বার আশায়। কিছুদিন এদিক ওদিক করেছি ঘোরাঘুরি চাকুরীর আর্জি নিয়ে। শেষে ঠাঁই মিললো 'বোম্বে সেন্টিন্যালে,' হর্নিম্যানের অধীনে।

ইতিমধ্যে য়ুরোপের যুদ্ধের তরঙ্গ এসে ভারতে পৌঁছেছে। জাহাজ করে রোজ আমদানী হচ্ছে পল্টনের দল। দেশ থেকে রপ্তানী হচ্ছে যুদ্ধের রসদ। ধনীর গৃহে এ যুদ্ধ এনেছে ঐশ্বর্য, গরীবের কুটীরে এনেছে করুণ আর্তনাদ।

কংগ্রেসের কাছে এ যুদ্ধ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলে দেয়া হয়েছে দেশের শাসনকর্তাকে। পূর্ণ সহায়তার পরিবর্তে চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, এই তাদের দাবী। কিন্তু সরকার রইলেন অবিচলিত। দেশের শাসনতন্ত্রের কোন অদল বদল ঘটলেন না।

দিন কেটে বৎসর ঘুরে এলো। দেশের স্বাধীনতার আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠলো। এই সংগ্রামে যোগ দিতে এলো অসংখ্য নরনারী। কেউ দিলো প্রাণ, কেউবা গেলো কারাগারে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের বেগ বেড়ে গেলো। যাভা, সুমাত্রা, বর্মার পতন হলো দ্রুতগতিতে। শংকিত হয়ে উঠলেন সরকার। সুদূর প্রাচ্যে হিন্দুস্থান তাদের শেষ ঘাঁটি। এর পতন হবে ইংরেজের মৃত্যুর সামিল। বিপদ আসন্ন বুঝে চার্চিল সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সকে।

ক্রীপ্‌স বামপন্থী, নিরামিষাহারী। আইন ব্যবসায়ে ছিল প্রখর বুদ্ধি ও প্রসার। ভারতের জাতীয় সংগ্রামে তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিংবদন্তী আছে যে এই সংগ্রামকে একবার সাফল্যমণ্ডিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই মর্মে এক খসড়া তৈরী করেছিলেন। তার একটা কপি পাঠিয়েছিলেন হোয়াইট হলের কর্তাদের কাছে। কিন্তু সে প্রস্তাব ফাইল চাপা পড়ে যায়।

যখন লড়াই বাধলো তখন ক্রীপ্‌স গেলেন মস্কোতে। ব্রিটিশ সরকারের রাজদূত হয়ে। সেখানে যুদ্ধের প্রথম ভাগে তাঁকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। মস্কোর কর্তাদের সাহচর্য তিনি সচরাচর পাননি কিন্তু তবু নিরাশ হ'ননি। কিন্তু একদিন যুদ্ধের দাবা খেলায় ক্রীপ্‌স জিতলেন। রাশিয়াকে দলে টানলেন।

এই সাফল্যের পর ক্রীপ্‌স যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর জয়জয়কার পড়ে গেলো। জনমতকে তুষ্ট রাখবার জন্যে চার্চিল তাঁকে নিলেন মন্ত্রীসভায়। আর সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে বিয়াল্লিশের মার্চ মাসে ক্রীপ্‌সকে দিল্লীতে পাঠালেন।

ক্রীপ্‌সের আগমন এদেশে সাড়া আনলো। তিন নম্বর কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে পড়লো তাঁর ছাউনী। প্রাচীরের অন্তরালে বৈঠকে বসলো দেশের নেতৃবৃন্দের। এপারে রইলো সাংবাদিকবৃন্দ।

প্রথম দিন দেখা করতে এলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদ। কথাবার্তা হলো দোভাষীর সাহায্যে। মৌলানা সাহেব ইংরাজী জানেন কিন্তু বলেন না।

গান্ধীজি তখন সেবাগ্রামে। ক্রীপ্‌স তাঁকে টেলিগ্রাম পাঠালেন।

তারপর এলো এক ঐতিহাসিক দিন। ভারতের ইতিহাসে এ দিনটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২৭শে মার্চ, গান্ধীজি এলেন

ক্রীপ্সের সঙ্গে দেখা করতে। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে রইলো জনসমুদ্র। নিভৃতে দুই নেতার আলাপ আলোচনা হলো।

আলোচনা অন্তে গান্ধীজি যখন বেরিয়ে এলেন তখন রিপোর্টারের দল ঘিরে ধরলো। তাদের এড়াবার জন্য তিনি ক্রীপ্সকে নিয়ে ছবি তুললেন। প্রশ্নবান শুরু হলো চারদিক থেকে। এর জবাব দিলেন গান্ধীজি নানা কায়দায়। সাংবাদিকের দল নাছোড়বান্দা, বিশেষ করে আয়েঙ্গার, 'পাটনার ইণ্ডিয়ান নেশনে'র।

শোনা গেলো গান্ধীজি ক্রীপসের কথাবার্তায় সন্তুষ্ট হ'ননি। "এই যদি আপনার দেবার থাকে," গান্ধীজি তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় নাকি বলেছেন, "তবে আপনি দেশে ফিরে যেতে পারেন।" হেসে ক্রীপ্স জবাব দিয়েছিলেন, "আপনার কথা ভেবে দেখবো।"

কিন্তু ক্রীপ্স আলোচনা চালালেন। দেশের নেতাদের তিনি আশ্বাস দিলেন যে লড়াই যখন শেষ হবে তখন ভারতীয়দের হাতে দেয়া হবে দেশের শাসনভার।

কিছুদিন বাদে সেবাগ্রামে গান্ধীজি চলে গেলেন। ক্রীপ্স মিশনের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য সাংবাদিক মহলে চাঞ্চল্য এনে দিল। একদিন শোনা গেল কংগ্রেস ক্রীপ্সের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে আর ক্রীপ্স নতুন অফার দিয়েছেন রাজপ্রতিনিধির অজান্তে। ক্ষিপ্ত হয়েছেন লর্ড লিন্‌লিথগো। ব্যাকুল হয়ে প্রতিবাদ করেছেন চার্চিলের কাছে।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, এপ্রিলের নয় তারিখ। ক্রীপ্সের নতুন অফার কংগ্রেস মহলে আশার সঞ্চার করলো। কিন্তু বাধা

এলো চার্চিলের কাছ থেকে। আদেশ হলো নতুন অফার তুলে নেবার। ক্রীপ্‌স মিশন ব্যর্থ হলো। মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা সবাই প্রত্যাখ্যান করলো ক্রীপসের প্রপোজাল।

বিলাতের সংবাদপত্রগুলো দোষ দিল গান্ধীজির। তারা মন্তব্য করলো যে এই ব্যর্থতার জন্য গান্ধীজিই দায়ী। কেউ কেউ গুজব রটালো যে সেবাগ্রাম থেকে গান্ধীজি টেলিফোনে কংগ্রেসকে নিষেধ করেছেন ক্রীপসের প্রস্তাব মেনে নিতে। গান্ধীজি এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বললেন, "মিছে কথা, আমি সেবাগ্রাম থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে টেলিফোন করিনি। যদি ওরা পারে প্রমাণ করুক।"

* * *

ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতায় দুঃখিত হলেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট। ক্রীপস যেদিন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রওনা হয়েছিলেন, রুজভেল্ট এক দীর্ঘ আবেদন পাঠিয়ে ছিলেন চার্চিলের কাছে, ভারতের সমস্যা সমাধান করবার জন্যে। অনুরোধ করলেন তাঁকে এই মীমাংসার শেষ চেষ্টা করতে। তিনি লিখলেন—

India is none of my business and for the love heaven do not bring me into this though I do want to be of help.

পত্র পেয়ে হাসতে থাকেন চার্চিল। বলেন, পাগল আর কী!

কিন্তু রুজভেল্টের চিঠির একটি অংশ তিনি মেনে নিলেন। সে হলো—

'India is none of my business.' "হিন্দু কংগ্রেসের" হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চার্চিল রাজী হলেন না।

সাংবাদিক মহলে ক্রীপসের ব্যর্থতায় কোন বিষাদের চিহ্ন দেখা গেল না। আলোচনার প্রথম দিক থেকে আন্দাজ করা গিয়েছিল যে এই কথাবার্তা ব্যর্থ হবে।

ক্রীপসের আন্তরিকতার দৈন্য ছিল না কিন্তু অভাব ছিল ক্ষমতার। প্রতি পদে-পদে তাঁকে বাধা পেতে হয়েছে চার্চিল, লিনলিথগো ও শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। আলোচনা যখন ব্যর্থ হয়ে এসেছে তখন রুজভেল্টের প্রতিনিধি লুই জনসন গোপনে তার পাঠালেন প্রেসিডেন্টের কাছে। আবার অনুরোধ এলো রুজভেল্টের কাছ থেকে। চার্চিল জবাব দিলেন: 'অসম্ভব, আলোচনা চালানো সম্ভব নয়, কারণ ক্রীপ্‌স দেশে ফিরে এসেছে।'

ব্যর্থতার খবর যখন প্রেসক্যাম্পে পৌঁছল তখন সবাই মন্তব্য করলেন: India is one area where the minds of Roosevelt and Churchill will never meet.

কথাটা অসত্য নয়। বহু বছর আগে চার্চিল একবার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন গান্ধীবাদ ধ্বংস করবার। কারণ গান্ধীবাদ হচ্ছে দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। তারপর যখন তাঁর হাতে ক্ষমতা এলো তখন তিনি ক্রীপ্‌সকে করলেন এই ধ্বংসের শিখণ্ডী। ভারতবর্ষ হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের সম্পত্তি। কী করে তিনি এই সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে পারেন? কী করে তিনি ক্রীপসের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন?

* * *

ক্রীপস বিলেতে ফিরে যাবার পর সমস্ত দেশে এলো নৈরাশ্যের ছায়া। কিন্তু নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করলেন গান্ধীজি।

ক্রীপস দেশে ফিরে যাবার কিছুদিন পরে গান্ধীজি হোরেস আলেকজাণ্ডারকে এক চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে প্রথম ইঙ্গিত করলেন 'কুইট ইণ্ডিয়ার' প্রস্তাব। কিছুদিন বাদে 'হরিজন' পত্রিকায় এর বিশ্লেষণ করলেন।

একদিন জওহারলাল এসে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন: বাপু, সবাই বলছে যে আপনি জাপানীদের সমর্থক হয়েছেন।

গান্ধীজি হেসে প্রশ্ন করেন, তুমি কী বলো?

নেহেরু জবাব দেন না। গান্ধীজি বলেন: যারা বলে আমি জাপানীদের সমর্থক হয়েছি তারা ভুল বলে। আমি আজ এমন কিছু বলছি নে বা করছি নে, যার জন্যে ব্রিটিশ রাজশক্তি বিপন্ন হতে পারে।

মে'র শেষে বোম্বের জুহুর সৈকতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন স্টুয়ার্ট গেল্ডার। গেল্ডার 'লণ্ডন নিউজ ক্রনীকেলের' সংবাদদাতা। বহুদিন ধরে মহাদেব দেশাইকে তাগিদ দিচ্ছিলেন গান্ধীজির সঙ্গে ইনটারভ্যিউর জন্যে। সমুদ্রের তটে বসে গান্ধীজি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কুইট ইণ্ডিয়ার প্রস্তাব ব্যাখ্যা করলেন। বিদেশী সরকারের কাছে আবার অনুরোধ করলেন এ দেশ ত্যাগ করতে।

গেল্ডারকে গান্ধীজি বললেন: "জওহারলাল এসে আমায় বলেছে ক্রীপসের কথা। ওর প্রশংসা করেছে অজস্র। কিন্তু তবু ক্রীপসের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হলো। ক্রীপ্স চলে যাবার পর আমি সারাক্ষণ বসে ভেবেছি এই সংকটে আমার কী কর্তব্য। সোমবার ছিল মৌন দিবস। একা বসে চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ আমার মনে এল 'কুইট ইণ্ডিয়ার' প্রস্তাব"।

কিন্তু আপনি কেন লড়াইয়ের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন না? ব্রিটিশ সরকার তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে যুদ্ধশেষে তারা শাসনভার আপনাদের হাতে তুলে দেবে, গেল্ডার বলে।

গান্ধীজি জবাব দেন: না, আমি যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না। এই হচ্ছে আমার কাজ করার শুভমুহূর্ত।

দু দিন বাদে 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে'র এ, টি স্টিল এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজি তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে কেউ যদি তাঁকে বোঝাতে পারে যে এই সঙ্কটের সময় ভারতকে স্বাধীনতা দিলে মিত্রশক্তির পরাজয় হবে তবে তিনি তাঁর আন্দোলন পরিত্যাগ করবেন।

* * *

জুনের প্রথমভাগে সেবাগ্রামে মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার দেখা করলেন গান্ধীজির সঙ্গে। ফিশার ছিলেন এককালে 'নিউইয়র্ক পোস্টের' বার্লিন সংবাদদাতা। এরপরে বহু স্থান তিনি ঘুরেছেন কাগজের রিপোর্টার হয়ে। প্যারিস, লণ্ডন, মস্কো, সব তাঁর নখদর্পণে।

একদিন গান্ধীজির প্রাতঃভ্রমণের সময় ফিশার সঙ্গ নিলেন। যেতে-যেতে অনেক কথা হলো। হঠাৎ তিনি গান্ধীজিকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আপনি কী ক্রীপসের প্রস্তাবের মধ্যে নতুনত্ব কিছুই খুঁজে পাননি?

গান্ধীজি জবাব দে'ন, আপনার প্রশ্নটি যেমনি সোজা তেমনি সরল কিন্তু উত্তরটা সোজা না। ক্রীপসের প্রস্তাবের মধ্যে আমি নতুনত্বের কোন স্বাদই পাই নি। আমি অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা

বুলিতে ভুলতে চাইনে। দেশের স্বাধীনতা আমি লড়াইয়ের শেষে কামনা করিনে। আমি দেশের মুক্তি চাই এক্ষুনি, আজই।

ফিশার প্রশ্ন করেন, আপনার সংগ্রাম বাস্তবে পরিণত করতে হ'লে প্রয়োজন হবে লোকজনের। কে আপনাকে সাহায্য করবে?

কেন কংগ্রেস, গান্ধীজি উত্তর দেন। যদি কংগ্রেসের কাছ থেকে সাহায্য না পাই তবে আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান দিয়ে এই সংগ্রাম চালাবো। সে প্রতিষ্ঠান হবো, আমি নিজে।

আচ্ছা, আপনার এই সংগ্রাম কি রাশিয়া বা চীনকে বিব্রত করে তুলবে না?

কই তারা তো আমার কাছে কখনও এই সংগ্রামের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। আমার এই প্রস্তাবে যদি কোন ত্রুটি থাকে তবে তারা দেখাক।

ফিশার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি আপনার মনের কথা ভাইস্‌রয়কে বলতে চাই।

দৃঢ়কণ্ঠে গান্ধীজি উত্তর দেন, আপনি স্বচ্ছন্দে ভাইস্‌রয়কে এই কথা বলতে পারেন। তিনি যদি চান, তবে খোলাখুলিভাবে আমার সঙ্গে কথা বলুন। আমি বুদ্ধি হারাইনি, বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে। আমি এমন কিছু করতে চাইনে যাতে চীন দেশ বিব্রত হয়।

ফিশার জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, আপনি জানেন যে আপনার এই সংগ্রাম শুরু হলে সরকার আপনার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন?

তার জন্যে আমি প্রস্তুত। আমি জানি যে কোন মুহূর্তে আমি গ্রেপ্তার হতে পারি। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আপনি

প্রয়োজন হলে আপনার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকেও বলতে পারেন। তাঁকে বলবেন যে আমি সর্বদাই এই সংগ্রাম তুলে নিতে প্রস্তুত। আপনার প্রেসিডেন্ট কিছুদিন আগে স্বাধীনতার চারটি অঙ্গকে ব্যাখ্যা করেছেন। আচ্ছা, তার মধ্যে মানুষের কি স্বাধীন হয়ে বাঁচবার কথাকে তিনি উল্লেখ করেন নি ?

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে ফিশার রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণীও তিনি রাজপ্রতিনিধিকে দিলেন। হেসে রাজপ্রতিনিধি জবাব দিলেন: মাই ডিয়ার ফিশার, এ হচ্ছে 'হাই পলিসির' ব্যাপার। This will have to be considered on its merits

* * *

সাতই আগস্ট, স্বাধীনতা সংগ্রামের আর একটি চিরস্মরণীয় দিন। বোম্বাইয়েব গউলিয়া ট্যাঙ্কেব ধারে পড়েছে কংগ্রেসের ছাউনী। দেশের নানাপ্রান্ত থেকে এসেছে কংগ্রেসসেবী। গান্ধীজির 'কুইট ইণ্ডিয়ার' প্রস্তাব দেশে এক নতুন জাগরণ এনে দিয়েছে। তাই সবাই এসেছে কংগ্রেসেব অধিবেশনে যোগ দিতে।

সাত-আট তারিখ হলো বৈঠক। দাবী করলো সবাই আন্দোলনের—দেশের মুক্তির জন্যে। তাবপর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব পেশ করা হলো।

অধিবেশনের প্রথম দিনে কংগ্রেস সভাপতি আজাদ জানালেন যে ক্রীপ্‌স মিশন ব্যর্থ হ'বার পর কংগ্রেসের পক্ষে এই সংগ্রাম শুরু করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তিনি সদস্যদের বুঝিয়ে দিলেন কুইট ইণ্ডিয়ার প্রস্তাব। কমিটির বৈঠকে প্রস্তাবের একটু

অদল-বদল হলো। ঘরোয়া বৈঠকে নেহেরু সামান্য আপত্তি তুললেন, গান্ধীজি তাঁকে বোঝালেন।

এর পরে গান্ধীজি তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু মাত্র গান্ধীজির কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। আশ্বাস দিলেন তিনি সবাইকে যে এই আন্দোলন এখনও শুরু হয়নি। তিনি আবার চেষ্টা করবেন রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করবার। 'আমি তাঁকে অনুরোধ করবো আমাদের এই দাবী মেনে নিতে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আমি কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হবো না'।

বলতে বলতে গান্ধীজির গলা ধরে এলো। তিনি একটু দম নিয়ে বলতে লাগলেন, 'আজ আমি আপনাদের এক নব মন্ত্রে দীক্ষিত করছি। যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে আপনারা এই মন্ত্র মনে গেঁথে নিতে পারেন। এই মন্ত্র হলো—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। হয় আমরা স্বাধীন ভারতে বাস করবো, নইলে দেশ স্বাধীন করবার চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দেবো। প্রতি কংগ্রেস সেবক-সেবিকার এই হবে মন্ত্র—দেশকে স্বাধীন করা। আজ থেকে আপনারা স্বাধীন ভারতের নাগরিক।'

এর পরে গান্ধীজি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'স্বাধীনতার সংগ্রামে আপনাদের দান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু আমি আপনাদের আজ অনুরোধ করবো পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে। আপনাদের হাতে আছে কলম, সরকারের কোন সাধ্যই নেই আপনাদের দাবিয়ে রাখতে পারে।'

গান্ধীজি এক নতুন প্রস্তাব সাংবাদিকদের কাছে করলেন। বললেন, আপনারা আপনাদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি তুলে দিন।

আপনারা সরকাবকে স্পষ্টাক্ষরে বলুন যে দেশ যতোদিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে ততোদিন আপনারা কোন কিছু লিখবেন না। যখন দেশ হবে স্বাধীন তখনই আবার শুরু হবে আপনাদের কাজ।'

সভা ভেঙ্গে গেল। সদস্যের দল নিশ্চিন্ত হয়ে গেল ঘুমুতে। সমস্ত বোম্বে শহর হলো শান্ত, শুধু উৎকণ্ঠায় জেগে রইলেন কয়েকজন সরকাবী কর্মচাবী। ঘুম থেকে তোলা হলো ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের স্টেশন সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে। হুকুম হলো, স্পেশাল ট্রেন চাই কিন্তু গন্তব্যস্থল রাখা হলো অজানা।

৯ই আগস্ট, ভোর চাবটা। মহাদেব দেশাই গান্ধীজিকে বললেন, 'শুনতে পাচ্ছি ওরা নাকি আপনাকে গ্রেপ্তার কববে।'

'পাগল হয়েছো!' গান্ধীজি জবাব দেন। 'কালকেব বক্তৃতার পর সরকার আমায় গ্রেপ্তার করবে না।'

গান্ধীজি প্রভাতের প্রার্থনার আয়োজন করতে লাগলেন। এমন সময়ে এক আশ্রমবাসী এসে খবর দিল যে পুলিশ কমিশনার গান্ধীজির সেক্রেটারীব সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন গ্রেপ্তারের পরোয়না, গান্ধীজি, মহাদেব দেশাই ও মীরা বেনের জন্যে। কস্তুরবা ও প্যারেলালের গ্রেপ্তারের আদেশ এতে নেই কিন্তু পুলিশ কমিশনার বললেন যদি তাঁরা গান্ধীজির সঙ্গে যেতে রাজী থাকেন তবে তাঁদের নিতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু কস্তুরবা ও প্যারেলাল যেতে রাজী হলেন না।

পুলিশ কমিশনার গান্ধীজিকে প্রস্তুত হয়ে নেবার জন্যে দু'ঘণ্টা সময় দিলেন। গান্ধীজি সঙ্গে নিলেন একখণ্ড গীতা, পবিত্র কোরান শরীফ্। প্যারেলালকে বলে গেলেন প্রত্যেক অহিংস সেবক-সেবিকা এক টুকরো কাগজে মন্ত্র লিখে রাখুক 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'

কাপড়ের মধ্যে রাখুক বেঁধে। যদি কখনও সংগ্রাম করতে করতে তার মৃত্যু হয় তবে এটাই হবে তার একমাত্র নিশানা যে সে ছিল অংহিসসেবী।

* * *

রাত্রি সাড়ে চারটা। গোপালস্বামী 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া'র চীফ্ সব-এডিটর। টাউন এডিশন ছাপতে দিয়ে এক কাপ কফির প্রত্যাশায় রেলওয়ে স্টেশনে ঢুকলো। ষ্টেশনের উল্টো দিকেই তার অফিস। পুলিশ তাকে বাধা দিল, বললে, যাবার হুকুম নেই। গোপালস্বামীর মনে সন্দেহ হলো। সে নিঃশব্দে স্টেশনের এক কোণে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ বাদে দলবলসহ গান্ধীজি এসে উপস্থিত হলেন। ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে গোপালস্বামীর দেরী হলো না। বুঝতে পারলে যে সমস্ত কংগ্রেসনেতাদের আটক করা হয়েছে। সে সেই মুহূর্তে তার অফিসে চলে গেল। টাউন এডিশন তখনও ছাপা হয়নি। মেশিন বন্ধ করে সে প্রথম পেজের ম্যাটার ভেঙ্গে দিল। তারপর বায়াত্তর পয়েন্টের ব্যানারে দিল গান্ধীজির গ্রেপ্তারের খবর।

এর কিছুক্ষণ বাদে নেহেরুকে গ্রেপ্তার করা হলো। পুলিশ দেখে তিনি সশব্দে চেঁচিয়ে উঠলেন : হুররা! ম্যঁয় তো বহুত দিনোসে আপকে লিয়ে এন্তেজার কর রহাহুঁ।

পরদিন প্রভাতে এ দেশে এক নতুন যুগ এলো। আগুনের মতো এ খবর ছড়িয়ে পড়লো—দেশে-বিদেশে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত ইংরেজবিদ্বেষ প্রকাশ পেলো বিভিন্ন আকৃতিতে। স্বদেশী নেতাদের আটকের হিড়িক পড়ে গেলো। আন্দোলন শুরু হয়ে গেলো, পুলিশ বেপরোয়া হয়ে লাঠি চালালো। তাদের সাহায্য করতে এলো মিলিটারী।

স্পেশাল ট্রেন গান্ধীজিকে নিয়ে এলো পুণায়। প্রথমে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো চিনচাওয়াদে। গাড়িতে কথাপ্রসঙ্গে কথা উঠলো 'অনশন ব্রত' সম্বন্ধে। নেহেরু বললেন, অহিংসা ও সিক্রেসি এক জিনিস নয়।

গান্ধীজি হেসে জবাব দেন, অহিংসা কী জিনিস সেটা বিশ্লেষণ করার অধিকার সম্পূর্ণ তোমার।

গান্ধীজিকে চিনচাওয়াদ থেকে মোটরে নিয়ে যাওয়া হলো। বাকীরা সবাই গেলেন লরীতে। এই বিদায় দৃশ্য হলো অতি করুণ।

পুণার কাছে আগা খাঁ প্রাসাদে তাঁকে আটক রাখা হলো। কিছুদিন পরে কস্তুরবাও এসে উপস্থিত হলেন।

দেশের বিশৃঙ্খলতার জন্যে সরকার এবার গান্ধীজিকে দোষী করলেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হলো পূর্ণোদ্যমে। বিলেত থেকে ভাড়া করে আনা হলো সাহিত্যিক দলকে। এদের নেতা হলেন বেভারলী নিকলস। বোম্বাইয়ের জে, জে হাসপাতালে শুয়ে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখলেন 'ভার্ডিক্ট অব ইণ্ডিয়া'। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো 'গুণ্ডারা নিপাত যাক্।'

আগা খাঁ প্রাসাদে আটক হবার পর নানা দুঃখ এসে হানা দিল গান্ধীজিকে। প্রথমে তিনি হারালেন তাঁর প্রিয় সঙ্গী সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মহাদেব ছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু। তাই তাঁর মৃত্যুতে তিনি শোকার্ত হয়ে উঠলেন। একদিন বিকাল বেলা মহাদেব হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন।

'মহাদেব, মহাদেব,' গান্ধীজি ডাকলেন। মহাদেব জ্ঞান হারিয়েছেন। কস্তুরবা বললেন, 'মহাদেব চোখ খোল, বাপু তোমায় ডাকছেন।' কিন্তু মহাদেব তখন অন্তিম শয্যায়।

জেল কর্তৃপক্ষ পুলিশ, ব্রাহ্মণ ও লরী নিয়ে এলো শবদাহ করার জন্যে। ক্ষিপ্ত হলেন গান্ধীজি। বললেন, 'পিতা তার ছেলের মৃতদেহ কখনো অপরিচিতের হাতে তুলে দেয় না। মহাদেব আমার কাছে ছেলের চাইতে বড়ো। ওর শেষ রীতি আমিই করবো। আমি জেল কর্তৃপক্ষের হাতে মৃতদেহ তুলে দেব না।'

বলতে বলতে তাঁর চোখ সজল হয়ে হলো। কিন্তু সরকার প্রথমে রাজী হলেন না। গান্ধীজি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। বললেন, 'নিজের ছেলের মৃত্যু নিয়ে আমি রাজনীতি করতে চাই নে। যদি সরকার মৃতদেহ বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে না দেয় তা হলে মৃতদেহ এইখানেই সৎকার হবে।'

জেল কর্তৃপক্ষ টেলিফোন করলেন দিল্লীতে। অনুমতি চাইলেন বড়ো কর্তাদের, বহু কল্পনাজল্পনার পর কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন গান্ধীজির প্রস্তাবে।

বিকেল বেলার দিকে মৃতদেহ দাহ করা হলো। পুলিশের আই, জি গান্ধীজিকে এসে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি মহাদেব দেশাইর আত্মীয়স্বজনদের কাছে খবর পাঠাবেন কিনা? গান্ধীজি রাজী হলেন। তারপরে লিখলেন: Sorry···লিখতে লিখতে হঠাৎ থামলেন। বললেন, 'মহাদেবের মৃত্যুবার্তা জানাতে আমি কেন দুঃখিত হবো। সে মরেছে মহান আদর্শ নিয়ে।' কেটে দিলেন 'দুঃখিত' শব্দটি।

তারপরে লিখলেন:

Mahadev died suddenly. Gave no indication. Slept

well last night. Had breakfast. Walked with me. Sushila, and Jail doctors did all they could but God had willed otherwise. Sushila and I bathed the body. Mahadev had died yogi's and patriots death. Only joy for such death...

তিন সপ্তাহ পরে সাধারণ ডাকপিয়ন মারফৎ এই সংবাদ মহাদেব দেশাইর আত্মীয়দের কাছে পৌঁছে দেয়া হলো।

* * * *

দেশের উচ্ছৃঙ্খলতায় গান্ধীজি অন্তরে দুঃখ পেলেন। তাই প্রথমে তিনি চিঠি লিখলেন বোম্বাইয়ের গভর্ণর রজার লামলীকে। তাঁকে অনুরোধ করলেন খবরের কাগজ দেবার জন্যে। জবাব পেলেন না এই চিঠির। কিছুদিন বাদে তিনি আবার রাজপ্রতিনিধির কাছে চিঠি লিখলেন, সরকারের দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ করে। এর জবাব এলো মামুলী ভাষায়, বলা হলো এ নীতির কোন পরিবর্তন হবে না।

এমনি ভাবে দিন কেটে গেলো—হলো বর্ষ শেষ। অনেকটা যখন শান্ত হয়ে এলো দেশের আবহাওয়া, তখন গান্ধীজি আবার রাজপ্রতিনিধির কাছে পত্র লিখলেন। অভিযোগ করলেন, আসামীর কাঠগড়ায় তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছে অথচ সুযোগ দেয়া হয়নি কোন জবাব দেবার। এ বিচার অন্যায়। তাই সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি ঠিক করছেন উপোস করবেন।

রুক্ষ জবাব এলো রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে। দেশের এই আন্দোলনের স্রষ্টা বলে গান্ধীজিকে আবার অভিযুক্ত করা হলো। এসেম্বলীতে এক প্রশ্নের উত্তরে হোম মেম্বার স্যর রেজিনাল্ড

ম্যাক্স্ওয়েল বললেন, গান্ধীজির উপোস হচ্ছে 'পলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেল'।

গান্ধীজি এর প্রতিবাদ করলেন। অস্বীকার করলেন যে এ উপোস তাঁর 'পলিটিক্যাল ব্ল্যাকমেল'। বললেন, এ হচ্ছে সর্বময়ের কাছে সুবিচারের প্রার্থনা।

এবার উপোসের ধারা বদলে দেয়া হলো। লেবুর রস হলো একমাত্র পানীয়। শরীর দুর্বল, তাই এই ব্যবস্থা। উপোসের দু' দিন আগে সরকার তাঁকে জানালেন যে এই সময়টা তিনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। গান্ধীজি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে এই ঐতিহাসিক উপোস শুরু হলো। সমস্ত দেশ হয়ে পড়লো চিন্তিত। দুদিন বাদে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়লো। এদিকে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলে ভাঙ্গন ধরলো। পদত্যাগ করলেন পার্শী ধনকুবের স্যর হোমী মোদী, নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীআনে। হোরেস আলেকজাণ্ডার গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিললো না। শুধু মাত্র দেখা করতে পেলেন শ্রীআনে।

অবস্থা সঙ্গীন হয়ে এলো ক্রমশই। বমির বেগভাব তীব্র হলো। উপোসের তেরো দিনে, দ্বারপ্রান্তে তুলসীর তলায় এসে দাঁড়ালেন কস্তুরবা, স্বামীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করলেন।

এবার মোসম্বীর রস জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হলো। অবস্থার পরিবর্তন হলো কিছুটা।

* * *

পঁচিশে এপ্রিলে পালাম বিমান ঘাঁটিতে উইলিয়ম ফিলিপস, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি, সাংবাদিকদের জানালেন গান্ধীজির

সঙ্গে তাঁর দেখা করবার ব্যর্থ চেষ্টা। 'আমার প্রবল ইচ্ছে ছিল গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করবার কিন্তু ইংরেজ সরকারের অনুমতি পাইনি,' তিনি সাংবাদিকদের বললেন।

*   *   *

উপোসের পর গান্ধীজির আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো।

ডিসেম্বর মাসে কস্তুরবা ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে শয্যাশায়ী হলেন। সুশীলা নায়ার, ডাক্তার গিল্ডার ও জীবরাজ মেটা এলেন কস্তুরবাকে দেখতে। বহু পত্রালাপের পর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত হলো।

ফেব্রুয়ারী মাসে কস্তুরবার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো। সরকার সম্মতি দিলেন গান্ধীজির আত্মীয়দের আগা খাঁর প্রাসাদে যাবার।

সারাদিন রুগীর শয্যাপাশে বসে রইলেন গান্ধীজি। কলকাতা থেকে পেনিসিলিন আনানো হলো। দেবদাস তাঁর মাকে ইঞ্জেকশন দিতে চাইলেন। গান্ধীজি বাধা দিলেন। মত্ত অবস্থায় জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালাল এসে তার মার পাশে দাঁড়ালো। হীরালালের এই অবস্থা দেখে কস্তুরবা কেঁদে ফেললেন। তিনি জ্ঞান হারালেন।

পরদিন কস্তুরবার মৃত্যু হলো।

*   *   *

স্ত্রীর মৃত্যুতে গান্ধীজি কাহিল হলেন বটে কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না। কিছুদিন পরে ছাড়া পেয়ে তিনি আবার দেশের কাজে মন দিলেন।

ইতিমধ্যে দেশে অদল-বদল হলো অনেক। লর্ড লিনলিথগোর জায়গায় এলেন লর্ড ওয়েভেল। বাংলায় তখন মন্বন্তর শুরু হয়ে গেছে। মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে রাস্তায় রাস্তায়। ওয়েভেল তলব করলেন সৈন্যবাহিনীকে, আদেশ দিলেন তাদের দুর্ভিক্ষের কাজ করতে।

মুক্তি পেয়ে গান্ধীজি প্রথমে এলেন পাঁচগনিতে। লণ্ডন 'নিউজ ক্রনিকেলের' স্টুয়ার্ট গেল্ডার আবার তার সঙ্গে দেখা করলেন সংবাদের লোভে। গেল্ডার গান্ধীজিকে বললে: আমার কাগজের সম্পাদক ভারতের এই সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্‌গ্রীব। এই ব্যাপারে কথা-বার্তা চালাবার জন্যে আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। কিন্তু নিরাশ হয়েছি। তাই এসেছি আপনার কাছে, আমি জানি যে আপনি আমায় নিরাশ করবেন না।

আশ্বাস পেয়ে গেল্ডার প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, ধরুন আপনি রাজ-প্রতিনিধি ওয়েভেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। আপনি তাঁকে কী বলবেন?

হাসতে থাকেন গান্ধীজি। বলেন যে তিনি দেখা করতে এসেছেন এই জটিল সমস্যা সমাধান করবার জন্যে। মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দেবার কোন সংকল্পই তাঁর নেই। এই জন্যে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। কংগ্রেসের মুখপাত্র হয়ে তাঁর কাজ করার কোন ক্ষমতা নেই।

গান্ধীজি স্টুয়ার্ট গেল্ডারকে স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে মিত্রশক্তির যুদ্ধের খরচ ভারত দেবে না।

যদি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে কী আপনি কংগ্রেসকে এতে যোগ দিতে বলবেন না? গেল্ডার প্রশ্ন করে।

গান্ধীজি সম্মতি জানালেন।

দুদিন বাদে লণ্ডন 'নিউজ ক্রনিকেলে' গেল্ডারের ইণ্ট্যারভিউ প্রকাশিত হলো। কিন্তু এই ইণ্ট্যারভিউর সামান্য প্রতিবাদ গান্ধীজি করলেন। তিনি বললেন যে-বিবৃতি কাগজে প্রকাশ হয়েছে তা

সম্পূর্ণ সত্য নয়। অনেক ঘটনা এর মধ্যে সত্য নয় বা প্রকাশ করা হয়নি। তিনি স্পষ্ট বললেন যে স্টুয়ার্ট তাঁর সঙ্গে শুধু মাত্র রিপোর্টার হিসেবেই দেখা করেননি। ভারতের সমস্যা সমাধান করতে স্টুয়ার্ট সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। এই জন্যেই তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু ইণ্ট্যারভিউ প্রকাশের অনুমতি দেননি।

দু'দিন বাদে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে গান্ধীজি 'গেল্ডার ইণ্ট্যারভিউ' বিশ্লেষণ করলেন।

তিনি বললেন যে 'গেল্ডার ইণ্ট্যারভিউ' প্রকাশ হবার পর অনেক কংগ্রেস সেবকদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে আগস্ট রিজল্যুশন বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে রিজল্যুশন বদলাবার বা বাতিল করবার অধিকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ছাড়া আর কারু নেই। আমার মতবাদ, গান্ধীজি বললেন, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ক্রীপস্ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারিনি কারণ ওদের মতলব ছিল ভারতকে ভাগ করে দেওয়া। দেশ ভাগ করা হবে স্বাধীনতার অন্তরায়।

তিনি আরো বললেন: আগস্ট রিজল্যুশন পাশ হবার পর প্রায় দুবছর কেটে গেছে। সবাই আমায় প্রশ্ন করছে যে আজ কী করে এই প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে। গেল্ডারের কাছে আমি যে ইণ্ট্যারভিউ দিয়েছিলাম তাতে আমি পন্থা বাৎলে দিয়েছি যে কী করে এই আগস্ট রিজল্যুশন কার্যকরী করতে হবে। আমি কংগ্রেসের পরাজয় মানতে রাজী নই। আমাদের জয় হবেই—আজ না হয় কাল, যেদিন ভগবান ইচ্ছে করেন।

এর কিছুদিন বাদে গান্ধীজি রাজপ্রতিনিধি ওয়েভেলের কাছে চিঠি লিখলেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন গেল্ডার ইণ্ট্যারভিউর প্রতি।

ওয়েভেল বললেন যদি গান্ধীজি তাঁকে একটা প্রস্তাবের খসড়া দেন তবে তিনি সমস্ত বিষয় আবার তলিয়ে দেখবেন। গান্ধীজি তাঁর প্রস্তাবে জানালেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে সত্যাগ্রহ রদ করবার পরামর্শ দিতে রাজি আছেন এবং কংগ্রেস এই যুদ্ধের সঙ্গে সহযোগিতা করবে যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার প্রয়াস ব্যক্ত করেন এবং কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তার এক শর্ত থাকবে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার কোন ব্যাঘাত করা হবে না কিন্তু সে প্রচেষ্টার জন্যে ভারতকে আর্থিক দায়িত্ব নিতে বলা হবে না।

পাঁচগনি থেকে গান্ধীজি এলেন বোম্বেতে। সেখানে আশ্রয় নিলেন শান্তিকুমার মোরারজীর বাড়ীতে। চেষ্টা করলেন আর একবার মৃতপ্রায় রাজনীতিকে সঞ্জীবিত করে তুলতে। এবার ধরলেন এক নতুন পন্থা। গান্ধীজির এই নতুন রাজনীতির লক্ষ্য হলেন কায়েদ-ই-আজম মোহম্মদ আলী জিন্না।

দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে জিন্নার অভ্যুদয় শান্তির প্রতীক হিসেবে নয়, ধ্বংসের স্রষ্টা বলে। তাঁর ধমনীতে বইছিল হিন্দুর রক্ত কিন্তু সেই রক্তের কণিকাই একদিন জেহাদ ঘোষণা করলে তার পূর্ব-পুরুষের বংশধরের বিরুদ্ধে। রাজনীতিতে হাত পাকিয়েছেন জিন্না কংগ্রেসের তিলক পরে। একদিন তাঁর দেশপ্রেম দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার করেছিল। পরিহাসচ্ছলে সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন, দেশের সঙ্কটে জিন্না হবেন অমর। তাই দেশের সঙ্কটে জিন্না সত্যিই চিরস্মরণীয় হলেন—শান্তির দূত হিসেবে নয়, বিভেদের প্রতাক বলে।

জিন্নার কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সঠিক কারণ আজও স্পষ্ট

জানা যায় নি। পারিবারিক জীবন তাঁর সংসারে দুর্যোগ এনেছিল। বিয়ে করেছিলেন দু'বার। জিন্নার বিলেতে পাঠ্যাবস্থায় প্রথম স্ত্রী মারা গেলেন। সে স্ত্রীর মুখদর্শন করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন বিলেত থেকে ফিরে এসে ধনকুবের স্যর দীনশা পেটিটের মেয়েকে।

যেদিন জিন্নার দ্বিতীয় স্ত্রী জন্ম গ্রহণ করেন সেদিন জিন্না ছিলেন স্যর দীনশার বাড়ীর অতিথি। স্যর দীনশা এই নবজাত শিশুকে জিন্নার কোলে তুলে দিয়ে বললেন, এর ভার নেবার অধিকার আমি তোমায়ই সর্বপ্রথম দিলাম।

আঠারো বছর পরে জিন্না এই মেয়েকে বিয়ে করেন।

মিসেস জিন্না ইস্‌লামে বেশী বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন হাল ফ্যাসানে দুরস্ত—প্রকাশ্যেই লিপস্টিক, রুজ ব্যবহার করতেন। তার প্রমাণ তিনি দিয়েছিলেন এক সভায়। জিন্না সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিটারী বাজেটের বিরুদ্ধে জোর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হয়ে তাই শুনছিল। এমনি সময় মিসেস জিন্না উপস্থিত হলেন। সবার নজর পড়লো তাঁর উপর। জিন্না-পত্নী কোন দিকে তাকালেন না। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তিনি তাঁর প্রসাধন চর্চায় মন দিলেন।

স্ত্রী মারা যাবার পর জিন্না বিচলিত হয়ে পড়লেন। সাময়িক ভাবে রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন। প্র্যাকটিশ করতে চলে গেলেন বিলেতে, এ দেশের জনসাধারণ জিন্নার কথা প্রায় ভুলেই গেলো। এইখানে তাঁর প্রথম কংগ্রেস বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। শোনা যায় একদিন তাঁর এক বন্ধু ঠাট্টাচ্ছলে বলেন, জিন্না, নেহেরু নাকি বলেছে, ইউ আর ফিনিশ্‌ড্‌। শুনে জিন্না উত্তেজিত হয়ে পড়েন—

পরের জাহাজে তিনি দেশে চলে এলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে।

আর একবার লক্ষ্ণৌতে। কোন এক পার্টিতে জিন্না ছিলেন উপস্থিত। সেখানে আরো কয়েকজন বিদেশী মহিলা ছিলেন। জিন্নার কথাবার্তা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁদের মধ্যে একজন জিন্নাকে দেখিয়ে গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন—উনি কোন দেশের মহারাজা ?

হেসে গৃহস্বামী জবাব দিয়েছিলেন, উনি মহারাজা ন'ন, উনি মোহাম্মদ আলী জিন্না। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন—উনি সত্যিই একদিন মহারাজা হবেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল উনিশ-শ সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্টে। কায়েদ-ই-আজম জিন্না হলেন পাকিস্তানের হর্তাকর্তা বিধাতা।

স্ত্রী-বিয়োগের পর জিন্নার জীবন কেটেছে অতি নিঃসঙ্গে। জিন্নার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করে তাঁর একমাত্র কন্যাও তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। শুধু মাত্র সঙ্গী রইলেন তাঁর ভগিনী ফতেমা জিন্না—জীবনপ্রদীপ নিভবার আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর কাছে ছিলেন। করাচীতে যখন জিন্না অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন মেয়ে এসেছিল একবার তার বাবাকে দেখতে, কিন্তু জিন্না যে দিন ভালো হয়ে উঠলেন সেদিনই তাকে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন।

জিন্নার প্রতি কাজে ফুটে উঠতো এই নিঃসঙ্গতার ছাপ। বিদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি মুস্‌লিম লীগকে প্রাণ দিলেন। হাজার হাজার মুসলমানের প্রাণে জাগিয়ে তুললেন পাকিস্তানের স্বপ্ন। তিনি ধর্মে বিশ্বাস করতেন না,—কোরানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অতি কম

তবু এই কোরানের আদর্শে তিনি পাকিস্তানের কাঠামো তৈরী করলেন ধর্মের ভিত্তিতে। আর যে পাকিস্তানের প্রতিমা তিনি গড়লেন তাতে প্রাণ-সঞ্চার করলেন ব্রিটীশ সরকার।

* * *

চুয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে হঠাৎ খবর এলো গান্ধীজি দেখা করবেন জিন্নার সঙ্গে। খবরটা নতুন কিছু নয়। এই দুই নেতার মধ্যে মিলন ঘটাবার তালে ছিলেন রাজাগোপালাচারী। এ ছাড়া যখন গান্ধীজি ছিলেন আগা খাঁ প্রাসাদে তখন তিনি একবার জিন্নার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষ সে চিঠি জিন্নার কাছে পাঠাতে রাজী হননি।

গান্ধী-জিন্না কথাবার্তা শুরু হলো। আলোচনার ভিত্তি রাজাগোপালাচারী ফর্মূলা। তাই একদিন বিকেলবেলা আমরা রিপোর্টারের দল হাজির হলাম জিন্নার মালাবার হিলের বাড়ীতে।

বিকেলের দিকে গান্ধীজি জিন্নার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে এলেন প্যারেলাল। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জিন্না সাদর অভ্যর্থনা করলেন।

তিন ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা হলো। দ্বারের অন্তরালে রইলেন দুই নেতা। আমাদের স্থান হলো বাড়ীর লনে। সময়টা কাটানো গেল তাস খেলে কিন্তু দিনশেষে খবর মিললো না কিছুই।

সেদিন আমরা ভেবেছিলাম যে এই দুই নেতার মিলন অসম্ভব নয়। আলোচনা শেষে গান্ধীজিকে জিজ্ঞেস করলুম, কি নিয়ে যাচ্ছেন জিন্নাসাহেবের বাড়ী থেকে ?

এক গোছা ফুল দেখিয়ে গান্ধীজি জবাব দেন, বাঃ রে দেখতে পাচ্ছোনা আমি ফুল নিয়ে যাচ্ছি ?

প্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন জিন্না স্বয়ং। মামুলী ধরনের গতানুগতিক বুলি। শুধু এক জায়গায় বললেন: কাল পবিত্র রমজানের দিন। মিঃ গান্ধীকে আমি অনুরোধ করেছি যেন দয়া করে কাল আলোচনা স্থগিত রাখা হয়।

এখানে গান্ধীজি বাধা দিলেন। বললেন: দয়া নয়, আমি আপনার কাছে "উইলিং টু সারেণ্ডার।"

এমনি ভাবে কাটলো ছয়দিন। রোজই যাওয়া আসা। রোজই দুই নেতা একে অন্যকে চিঠি লিখতেন, শূন্য হাতে ফিরে আসা হলো আমাদের দৈনন্দিন কাজ। একদিন শোনা গেলো দুই নেতার মিলন হয়নি। খবরটা স্কুপ করলে 'ফ্রী প্রেস জার্নাল।' খবর পড়ে জিন্না বললেন, বোগাস। গান্ধীজি বললেন, আমাদের আপনারা নিরিবিলিতে আলাপ করতে দিন।

কিন্তু এই দুই নেতার মিলন হলো না। জিন্না এই কনফারেন্সে আবার দাবি করলেন যে সমস্ত মুসলমান ভিন্ন জাতি—তার সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ সবই ভিন্ন। গান্ধীজি এই দাবিকে অস্বীকার করলেন। একে তিনি মনে করলেন অন্যায়। তবু তিনি রাজী হলেন তাঁর সারাংশ প্রস্তাবে। পত্রে তিনি জিন্নাকে অভিবাদন করলেন কায়েদ-ই-আজম জিন্না বলে। স্বীকার করলেন তাকে মহান নেতা বলে। গান্ধীজি জিন্নার কাছে অনুমতি চাইলেন মুস্লিম লীগের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করবার। জিন্না রাজী হলেন না। আপত্তি তুললেন। ভারতকে ভাগ করা চাই ইংরাজ থাকতে থাকতে, প্রকাশ্য সায় এলো কনসারভেটিব সরকারের পক্ষ থেকে।

* * *

পনেরোই আগস্ট রাত্রি বেলা আমার এই সব পুরানো কথা মনে জাগছিল। মনে হলো জিন্না তাঁর পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিয়েছেন—হার হয়েছে গান্ধীজির। যদি গান্ধীজি জিন্নার প্রথম প্রস্তাব মেনে নিতেন তা হলে হয়তো দেশে রক্তের হোলী বইতো না।

তাই পনেরোই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ, বেলেঘাটায় গান্ধীজির ক্যাম্প রয়েছে নিস্তব্ধ। স্বাধীনতার উৎসবের তরঙ্গ এসে এখানে আঘাত করেনি। এ শিবিরের অধিপতি হয়েছেন যুদ্ধে পরাজিত—তাই আজ তিনি ক্লান্ত-গভীর নিদ্রায় অচেতন।

তিন

দেশের স্বাধীনতায় গান্ধীজি বিশেষ উচ্ছ্বসিত হলেন না—তাই কিছুদিন বাদে ঠিক হলো যে তিনি নোয়াখালী যাবেন। মাঝের কয়েকটা দিন তাঁর কাছে বহু দেশ থেকে বাণী এসেছে, ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষা কামনা করে। কিন্তু গান্ধীজি অবিচলিত রইলেন। এটা ছিল তাঁর স্বভাব—আনন্দ ও দুঃখের মাঝে স্থির থাকা। নিজের উচ্ছ্বাসকে কখনো প্রকাশ করেন নি ভাষায় ও ভাবে। কলকাতায় যে আনন্দের সাড়া পড়েছিল তাতে তিনি অন্তরের সায় দিতে পারেন নি। তাই তিনি স্থির করলেন যে নোয়াখালীর পল্লীগ্রামে তিনি তাঁর আস্তানা গাড়বেন। সঙ্গে যাবেন মুস্‌লিম নেতা শহীদ সুরাবর্দী।

নোয়াখালী যাবার কল্পনা কাউকে বিস্মিত করলো না। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে তখনো অনেকে নোয়াখালীর গ্রামে শান্তির কাজ করছিলেন। নোয়াখালী ছেড়ে আসার সময় তিনি নিজেও গ্রামবাসীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি আবার নোয়াখালী

ফিরে যাবেন। কিন্তু তাঁর সে সংকল্প কখনো বাস্তবে পরিণত হয়নি। দিল্লী থেকে তিনি যাত্রা করেছিলেন নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে, কিন্তু সোদপুরে এসে হঠাৎ তাঁর মতির পরিবর্তন হলো।

যাবার আগের দিন সন্ধ্যাকালে ব্যুইক গাড়ি চড়ে সুরাবর্দী এলেন গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে। বিকেলে প্রার্থনা সভায়ও একটা আভাষ পাওয়া গিয়েছিল যে নোয়াখালী যাত্রা স্থগিত থাকবে। বহুক্ষণ ধরে দুই নেতা মগ্ন রইলেন বাক্যালাপে। আলোচনা শেষান্তে সুরাবর্দী সাংবাদিকদের জানালেন যে গান্ধীজি স্থির করেছেন যে নোয়াখালীর পরিবর্তে তিনি ক'লকাতার দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করবেন।

সুরাবর্দী সাহেব শুধু হুনিয়ার ন'ন হুঁসিয়ারও বটে। গান্ধীজির সংকল্পের কথা বললেন বটে কিন্তু চেপে গেলেন জায়গার নামটা। কিন্তু রিপোর্টারের দল নাছোড়বান্দা, তাদের কাছে অজানা রইলো না এ জায়গার নাম।

এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেলো পরদিন। দুপুরের কিছুটা বাদে রওনা হয়ে গেল ক'লকাতাভিমুখী। সারিবন্দী মোটরগাড়ি। রাস্তার দু'ধারে অগণিত জনসমুদ্র। সে জনতার শেষ হয়নি কোথাও, এমন কি বেলেঘাটা অঞ্চলেও। বরং টের পাওয়া গেল যে এ অঞ্চলের জনতা কিছুটা চঞ্চল। এদের মধ্যে কেউ কেউ ঘিরে ধরলেন গান্ধীজির গাড়ি। উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃই বেড়ে গেল। ধ্বনি উঠলো, 'গো ব্যাক গান্ধী, গো টু পার্ক সার্কাস।' জনতা বৃদ্ধি পেলো নতুন আশ্রমের সামনে। একদল ভেতরে ঢুকে শুরু করে দিল ঢিল ছোঁড়া। সার্সী জানলা ভেঙে গেল। আহত হলেন হোরেস আলেকজাণ্ডার। কিন্তু গান্ধীজি অবিচলিত রইলেন। জনতার এই উদ্দামতা তাঁর

মনে কোন রেখাপাতই করলো না। কিছুক্ষণ বাদে জনতার মধ্যে থেকে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে আহ্বান করলেন নির্মলদা, গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। দীর্ঘ দুঘণ্টা ধরে চললো আলাপ। অনেকটা একতরফাই বলা যেতে পারে। তরুণের দল—যারা এই বিশৃঙ্খলতার পুরোভাগে ছিলেন তাঁরা শুনলেন গান্ধীজির উপদেশ। মাঝে মাঝে মৃদু আপত্তি উঠলো। কিন্তু গান্ধীজির অমায়িক হাসি তাঁদের শান্ত করে দিলো। আলোচনা যখন জমে উঠেছে তখন হঠাৎ গান্ধীজি ঘড়ি বের করে বললেন, রাত্রি দশটা, আমার ঘুমুবার সময় হয়েছে। আপনারা যেতে পারেন।

তরুণ নেতাগণ পরদিন থেকে গান্ধী আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবক হলেন। গান্ধীজির আদেশানুযায়ী পুলিশ-মিলিটারী উঠিয়ে দে'য়া হলো—দ্বারে প্রহরী রইলো পাড়ার তরুণ দল।

* * *

বিধাতা কিন্তু বাদ সাধলেন। নোয়াখালী যাবার সংকল্প এবারও ব্যর্থ হলো। ঘটনা ঘটলো অপ্রত্যাশিত ভাবে। নোয়াখালী যাবার আগের রাত্রে বেলেঘাটার ক্যাম্পে হানা দিল একদল যুবক। চেহারা বা আকৃতিতে এদের এমন কিছু ছিল না যাতে এদের বলা যেতে পারে ভদ্রস্থানীয় কেউ। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হল্লা করা, গৌণ উদ্দেশ্য অবশ্য সুরাবর্দীর সন্ধান।

প্রধানমন্ত্রীর গদী থেকে নেমে এসে সুরাবর্দীর পরিবর্তন হয়েছিল অনেক। মাত্র একবছর আগে বোম্বের মালাবার হিলে তিনি তাঁর নেতা কায়েদ-ই-আজম জিন্নাকে দিয়েছিলেন পূর্ণ সমর্থন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নাজিমুদ্দিন। রাজনীতির বানচালে সুরাবর্দী তাঁকে হারিয়েছিলেন তখন। কিন্তু কিছুদিন বাদে ভাগ্যচক্র

ঘুরে গেলো। পাকিস্তানের কাঠামো যখন তৈরী হলো, তখন সুরাবর্দীর গৌরব স্তিমিত হয়েছে। নাজিমুদ্দিন ছিলেন কায়েদ-ই-আজমের প্রিয়পাত্র, কাজেই অতি সহজে তাঁর স্থান হলো পাকিস্তানে। ব্যর্থমনোরথ হয়ে সুরাবর্দী হাত মেলালেন শরৎ বোস, কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে। রচনা করলেন স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা কিন্তু তাঁর সে কল্পনা হলো ধূলিসাৎ অচিরেই। জনতা ক্ষিপ্ত, বিশেষ করে সুরাবর্দীর প্রতি। শরৎ বোসের জনপ্রিয়তা অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে, বিশেষ করে তাঁর এই নতুন কল্পনা তাঁকে করে তুলেছে অপ্রিয়। আশ্চর্য হবার এতে কিছুই ছিল না। কারণ বাংলাদেশের জনপ্রিয়তা চলে অনেকটা পেণ্ডুলামের মতো। এ ছাড়া গান্ধীজিও অনেকটা শংকিত হয়ে পড়েছিলেন সুরাবর্দী সম্বন্ধে। তাঁর বুদ্ধির ছটা তাঁকে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিল। তাই প্রথমে তিনি সুরাবর্দীকে হাত করলেন, দীক্ষা দিলেন তাঁকে তাঁর অহিংসা মন্ত্রে। এই নবদীক্ষার স্থান হলো বেলেঘাটা ক্যাম্পে। প্রতিদিন তিনি প্রার্থনা সভায় সুরাবর্দীকে নিয়ে যেতেন কিন্তু তবু জনতা যোলোই আগস্টের কথা সহজে ভুলতে পারেনি। এর প্রমাণ দিল এই যুবকবৃন্দ।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এক সঙ্গীকে দেখিয়ে তারা দাবি করলে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা, গান্ধীজি ঘুমুতে গেছেন। তারা অভিযোগ করলে যে মুসলমানেরা তাদের সঙ্গীকে জখম করেছে। হল্লা শুনে গান্ধীজি বেরিয়ে এলেন। কিন্তু শান্ত করতে পারলেন না উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে। জনতার মধ্যে থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য করে একজন লাঠি ছুঁড়ে দিলে কিন্তু নিশানা ব্যর্থ হলো। সুরাবর্দীর সন্ধান না পেয়ে যুবকদল ফিরে গেলো। গান্ধীজি তাঁর

নোয়াখালী যাত্রা স্থগিত রাখলেন। পরদিন থেকে শুরু করলেন অনশন, জনতার এই ব্যবহারে দুঃখিত হয়ে।

রাত্রে খবর এলো যে কলকাতায় আবার দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে পূর্ণোদ্যমে।

* * *

সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতা 'কভার' করতে ব্রিটীশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন যে তিনজন নামজাদা সাংবাদিককে এ দেশে পাঠিয়েছিলেন, রিচার্ড শার্প ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। পনেরোই আগস্টের কিছুদিন আগে শার্প ক'লকাতায় চলে এলেন গান্ধী ক্যাম্পে। শার্প হাত পাকিয়েছেন সংবাদ সংগ্রহে, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর অতি তীক্ষ্ণ। এসেই তিনি সংগ্রহ করলেন সুরাবর্দীর কাছ থেকে এক বিশেষ ইণ্ট্যারভিউ। বন্ধুত্ব পাতালেন রাসেলের সঙ্গে।

রাসেল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, চিরকুমার, বন্ধুকে আশ্বাস দিলেন, ফিকৃর মাৎ করো ব্রাদার, আই শ্যাল গিভ্ ইউ অল হেল্প। সমস্ত কলকাতা আমার নখদর্পণে, কোথায় কী ঘটছে আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি।

শার্প আশ্বস্ত হলেন।

গান্ধী ক্যাম্পে রোজই আসতেন শার্প ও রাসেল। গান্ধীজির অনশনের সংবাদ আরো বহু নামজাদা সাংবাদিককে আকর্ষণ করলে। দিল্লী থেকে এলো 'ডেইলী মেলের র‍্যালফ্' ইজার্ড ও আলান মুরহেড।

অনশনের দ্বিতীয় দিন ক্যাম্পে একটু চাঞ্চল্য উঠলো। সন্ধ্যার একটু পরে এক ভলাণ্টিয়ার দৌড়ে এলো গান্ধীজির ঘরে। উত্তেজনায়

সে কাঁপছে। চীৎকার করে বললে, টেলিফোন ফ্রম ব্যাকিংহ্যাম প্যালেস। রাজা টেলিফোন করছেন গান্ধীজির কুশলতা প্রশ্ন করে।

আশ্রমবাসীদের একজন দৌড়ে গেলো টেলিফোনে কথা বলতে। রাসেল শার্পকে ডেকে বললে. বিরাট স্কুপ, ভেরী বিগ স্টোরী। তারপর পাকড়াও করলে সেই ভলান্টিয়ারকে, জেরা হলো নানান ভাবে।

খবর সংগ্রহ করে রাসেল ও শার্প গেলো টেলিগ্রাফ অফিসে। টেলিগ্রাম লণ্ডনে পাঠিয়ে দিল। তারপর রাসেল বললে, আই টোল্ড ইউ। আই এ্যাম দি অনলি জার্ণালিস্ট হ্যাভিং গুড কনটাকৃট ইন গান্ধী ক্যাম্প।

শেষ রাত্রে টেলিগ্রাফ পিয়নের ডাকে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। দুজনেই দেখতে পেলো তাদের হেড অফিস থেকে তার এসেছে। তারে তাদের জবাবদিহি করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে রাজার টেলিফোন করার কথা সমস্ত বাজে, ভুয়া। বি বি সি এই খবরের প্রচারের পর বাকিংহ্যাম প্রাসাদ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। টেলিফোন রাজা করেননি, করেছিলেন সুধীর ঘোষ, কিন্তু খবর তখন ছাপা হয়ে গেছে।

প্রভাতে গম্ভীর মুখ নিয়ে এলো শার্প ও রাসেল গান্ধী ক্যাম্পে। বিদ্রূপ করে শার্প রাসেলকে বললে: ইউর কনটাকৃট্ হ্যাজ ল্যাণ্ডেড মী ইন ট্রাবল।

গান্ধীজি তখন অনশন ত্যাগ করেন নি। আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে তাঁর অনশন ভাঙাবার। কিন্তু গান্ধীজির দৃঢ় পণ, যতোদিন না কলকাতাবাসী তাদের ভুল বুঝতে পারবে ততদিন তিনি অনশন ত্যাগ করবেন না। কথাবার্তা চলেছে যে সেদিন রাত্রে যারা

হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিল তারা এসে গান্ধীজির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সঙ্গে সঙ্গে নজর দেবে তাদের অস্ত্রশস্ত্র।

এই কাজে সাহায্য করলেন সোস্যালিস্ট নেতা রামমনোহর লোহিয়া। হাঙ্গামাকারীদের বোঝালেন যে গান্ধীজির প্রাণ রক্ষা করতে হবে। আগের দিন নতুন পুলিশ কমিশনার ঘুরে বেড়িয়েছেন অলিতে-গলিতে, গভীর রাত্রে তিনি হানা দিলেন হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের আড্ডায়। অনুরোধ করলেন এই হাঙ্গামা বন্ধ করতে, নইলে গান্ধীজির জীবন বাঁচানো হবে অসম্ভব।

প্রাতঃকালে গান্ধীজিকে বলা হলো যে গত রাত্রে কোথাও আর কোন গোলমাল হয়নি। কিন্তু এতেও গান্ধীজি আশ্বস্ত হলেন না। বিকেলের দিকে ভীমানী ও লোহিয়া নিয়ে এলেন কয়েকজন যুবক নেতাকে। তাঁরা এসে গান্ধীজিকে আশ্বাস দিলেন যে হাঙ্গামা বন্ধ হয়েছে, যারা এই গোলযোগের মূলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তারা ক্ষমা চাইলে গান্ধীজির কাছে। তাঁর পায়ের কাছে এরা রাখলে গোটা তিনেক স্টেন গান, কার্টিজ ও রিভলবার। নেড়ে চেড়ে দেখলেন গান্ধীজি সেগুলো, তারপর তুলে দিলেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের হাতে। অনুরোধ করলেন যেন এইসব লোকদের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করা হয়।

রাত্রি আটটার পর গান্ধীজি তাঁর অনশন ভাঙলেন। মোসম্বীর রস করে দেওয়া হলো গ্লাসে। হাতে তুলে দিলেন সুরাবর্দী। সমস্ত দরজা-জানালা প্রায় বন্ধ ছিল তবু একটুখানি ছিদ্র করে নিয়ে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার ম্যাক্স ডেসফর্ এক ঐতিহাসিক ছবি তুললেন অনশন ভঙ্গের। এদিকে বাইরের

আঙ্গিনায় তখন পায়চারী করছে রাসেল ও শার্প। তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, কিছুক্ষণ বাদে হদিস মিললো নির্মলদার। সমস্ত কথা খুলে বলা হলো তাঁকে।

পরদিন গান্ধীজি এদের তলব করলেন, সমস্ত ঘটনা যখন বলা হোলো তখন তিনি এদের দিলেন ধমক। এর পরে এদের দিলেন এক বিশেষ ইণ্টারভিউ। এতে এদের দুজনকার দোষটা অনেকটা লাঘব করে দেওয়া হলো।

* * *

এমনিভাবে আমাদের দিন কেটেছে গান্ধী-ক্যাম্পে। কখনো উত্তেজনার অবকাশ ঘটেনি, বিরাম হয়নি কোলাহলের বা সংবাদের ঘটেনি অভাব। দিনের পর দিন দেখেছি অগণিত জনতার স্রোতরাশি, নানা জাতের সংমিশ্রণ। বিভিন্ন মতধারায় এরা গঠিত, তবু সবার মিলন হয়েছে এই আশ্রমে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের সংকল্পে এঁরা আসতেন। যাঁদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন তাঁরা গান্ধীজির দর্শন পেতেন, বাকীর দল বিদায় নিতেন সেক্রেটারীর কাছ থেকে। তাই দেখেছি নির্মলদার অসীম ধৈর্য। কখনো শুনিনি কঠোর স্বরে কথা বলতে, তিরস্কার করে কাউকে তিনি কথা বলেননি বা দেখা না দিয়ে কাউকে বিদায় দেননি। স্মিত হাস্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সময় কাটিয়েছেন এদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

রোজই আসতো দর্শনার্থীর দল অজস্র। এদের মধ্যে কারু-কারু দেখা করার পন্থা ছিল অভিনব। স্বামীর পশ্চাতে আসতো মেদবহুল স্ত্রী, সঙ্গে থাকতো সিকি, দুয়ানি, আধুলির দল। পয়সা এদের কাছে

রক্ষাকবচ, 'সিসেমের' দ্বার খোলার ন্যায় এরাও এই রক্ষাকবচের ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন। বাধা পেলে নতুন পন্থার সৃষ্টি হতো। সঙ্গে থাকতো ঝক্‌মকানো নতুন মডেলের গাড়ী—নির্জনে আভাষ দিতেন যে এই গাড়ি মহাত্মাজীর জন্য মজুত। দু-একবার সুযোগও মিলতো প্রার্থনা সভায় নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু এঁরা প্রার্থনা শেষে হাওয়া হয়ে যেতেন গান্ধীজিকে নিয়ে। সর্বদাই উদ্‌গ্রীব গান্ধীজিকে নির্জনে পাবার জন্যে, তাঁদের পুঞ্জীভূত দুঃখের কাহিনী উদ্ঘাটন করার জন্যে। ব্যবসায়ে লাভের সারাংশ কম, এটাই অবশ্য সমস্ত কথার প্রতিপাদ্য। কখনো বা আসতেন নানা উপঢৌকন নিয়ে। ফ্যান্ বসাবার অছিলায় সস্ত্রীক চলে যেতেন ঘরে। গান্ধী-দর্শনের এই 'টেকনিক' সবাইকে বিস্মিত করে তুলেছিল—আরো বিচলিত করেছিল নির্মলদাকে। এঁদের কাছ থেকে বৃদ্ধকে দূরে রাখা ছিল এক বিরাট সমস্যা। আর একদল ছিলেন যাঁরা প্রশ্নবাণে গান্ধীজিকে জর্জরিত করে তুলতেন।

সাংবাদিকদের প্রতি গান্ধীজির লক্ষ্য ছিল অতি তীক্ষ্ণ। তাদের জন্যে প্রতিদিন তৈরী করতেন প্রার্থনা সভার বক্তৃতা, নিজ হাতে সেগুলো লিখে দিতেন। প্রার্থনা শেষে প্রসাদ হিসেবে সেগুলো মিলতো আমাদের।

স্পষ্ট মনে আছে, একদিন রাত্রে হঠাৎ ক্যাম্পের বাতি নিভে গেলো। মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা প্রার্থনা সভার বিবরণ লিখতে শুরু করে দিলাম, এমন সময়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গান্ধীজি। মোমবাতি দমকা বাতাসে নিভে যাবার ভয়ে ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তিরস্কার করে বললেন দরজা-জানলা খুলে দিতে, নইলে আমাদের

স্বাস্থ্য খারাপ হবে এই তাঁর আশংকা। বন্ধ ঘরে থাকা উচিৎ নয়।

অতি তুচ্ছ ঘটনা, তবু গান্ধীজির নজর এড়ায় নি। কখনো ভোলেন নি যে তাঁর সঙ্গে রয়েছে একদল কর্মী। তাই এদের সুখ-সুবিধার প্রতি তিনি ছিলেন সজাগ।

চার

গান্ধী-ক্যাম্পেই আমার সংগে অলোকানন্দার প্রথম পরিচয়। আলাপ হওয়াটা অনেকটা দুর্ঘটনাই বলতে হবে।

সারা দিনের কাজ শেষ করে একরাত্রিতে ফিরে আসছিলাম আফিসে, সঙ্গে ছিলেন বিমলবাবু।

বিমলবাবু ছিলেন পুলিশের একজন কর্তা। অতি অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তি। সারা জীবন চোর-জুয়াচোর ঘেঁটে তাঁর বাইরের খোলসটা হয়ে 'গিয়েছিল অতি কর্কশ কিন্তু অন্তরটা ছিলো সরল। ডিউটী দিতে মাঝে মাঝে আসতেন গান্ধী-ক্যাম্পে, সেই হিসেবে আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছিল। সময়ে অসময়ে, বিশেষ করে দিনের শেষে তিনি ছিলেন আমাদের ত্রাণকর্তা। তাঁর গাড়ীতে আমাদের ঠাঁই মিলতো। শুধু তাই নয়, বিমলবাবুর সুনাম হয়েছিল গান্ধী-ক্যাম্পে দুর্যোগের সময়। কিন্তু এই সুনামই তার চাকুরী জীবনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিমলবাবুর যশ কর্তাদের অহরহ দহন করতো, তাই চাকুরী জীবনে তিনি উন্নতি লাভ করেন নি।

পুলিশ সাহেব হওয়া সত্বেও বিমলবাবু ছিলেন অতি সৌখীন। অভিনয়ে দক্ষ ছিলেন।

বেমানান দেখালেও তিনি তার বিশাল বপু নিয়ে জাহানারা—রিজিয়ার পার্ট করতেন। রাশভারী পুলিশের গলাকে দক্ষতার সঙ্গে তিনি মিহি করে আনতেন, পান খাওয়ায় রপ্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে রাঙা ঠোঁট বানানো মুস্কিল হতো না।

সেদিন ছিল বিমলবাবুর ড্রেস রিহার্সাল, সন্ধ্যার একটু পরেই তার গাড়ীতে রওনা হওয়া গেলো থিয়েটার ক্লাবের উদ্দেশে। ওখানেই রিহার্সাল, স্বয়ং বিমলবাবুর কর্তা হবেন শাহ্‌জাহান, বিমলবাবু জাহানারা। কাজেই পালা জমবে এ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

দাঙ্গার দরুণ সমস্ত রাস্তা নির্জন হয়ে গিয়েছিল। শিয়ালদ'র মোড়ের কাছে এসে হঠাৎ এক নারীকণ্ঠের ধ্বনি শুনতে পেয়ে ড্রাইভার গাড়ী থামালে। অন্ধকারের আলোকে দেখ্‌তে পেলাম একটি মেয়ে এগিয়ে আস্‌ছে গাড়ীর পানে। কাছে এসে সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলে, 'আমায় একটু গাড়ীতে লিফ্‌ট দিতে পারেন, বড়ো বিপদে পড়েছি।'

বিমলবাবুর তখন থিয়েটারের আবেগ এসে গেছে, তাই সেই ভঙ্গীতেই জবাব দিলেন, ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।

নারীর আহ্বান চিরকালই মাধবদার প্রাণ ব্যাকুল করে তোলে, বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে। কাজেই বিমলবাবুর নিষেধ সত্বেও তিনি সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মেয়েটি বিনা দ্বিধায় চলে এলো।

মেয়েদের বয়স অনুমান করা রীতিমতো ক্রসওয়ার্ড পাজল করা, বিশেষ করে রাত্রিবেলা। তবে আন্দাজ করা গেলো বছর কুড়ি-একুশ হবে। চেহারার মধ্যে তার ছাপ ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের, তবে এতে সৌন্দর্যের কোন ভাঁটা পড়েনি। তবে সে সৌন্দর্যকে ধরে রাখার কোন চেষ্টা হয়নি। মেয়েটির নাম অলোকানন্দা।

অলোকার অকস্মাৎ আগমনে বিমলবাবু একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন। রিহার্সালের সময় তাঁর বয়ে যাচ্ছে, এইক্ষণে হঠাৎ বাধা পাওয়ায় বিরক্ত বোধ করলেন। কিন্তু তবু আপত্তি করলেন না। অলোকা গাড়ীতে উঠে বসলো।

অলোকার মধ্যে কোন সংকোচের ভাব ছিল না, তাই অতি অল্প সময়ে সে আলাপ ও আসর জমিয়ে দিলে।

সে কাজ করে এক সরকারী অফিসে, বিকেলের দিকে তার ডিউটি ছিলো। অফিসে যাবার পথে, শিয়ালদ'র কাছে এসে দেখে সমস্ত ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে দাঙ্গার ভয়ে। বাধ্য হয়ে সে হাঁটা দেয় বাড়ীর পানে। জনমানবশূন্য রাস্তায় হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে ডাকে।

অলোকা অনুরোধ করলে তাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিতে। বিমলবাবু তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন কিন্তু কিছু বলবার আগেই মাধবদা সানন্দে তাঁর সম্মতি দিলেন।

আলাপ-প্রসঙ্গে অলোকা দিলো তার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বৈচিত্র্যময় জীবন নয় তবু এতে থ্রিল আছে। কলেজে বি-এ পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। বাবা ছিলেন জমিদার, অন্তত তাই ব'লতেন। মেয়ের বিয়েও ঠিক করেছিলেন সুপাত্রের সঙ্গে কিন্তু যখন দেনা-পাওনার রফা হচ্ছিলো তখন গোল বাধলো। 'জমিদার' লেবেলটি দিলো পাত্রপক্ষকে প্রলোভন, দাম হাঁকলো যথেষ্ট। অন্তঃসারশূন্য জমিদারী চাল, পাত্রীর পিতা বুঝতে পারলেন যে এখানে আর এগুনো যাবে না। কিন্তু বাহ্যত প্রকাশ করলেন না তাঁর মনোভাব, দম্ভভরে সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিলেন। বিয়ের আশায় ইতি দিয়ে অলোকানন্দা এসে চাকুরীতে ঢুকলো। মা মত দিলেন কিন্তু বাবা তার নারাজ। ভাই তার বেকার কিন্তু

বোনের চাকুরী-পেশা তার অপছন্দ। অন্য মেয়ের চাকুরী-জীবন মন্দ নয় কিন্তু নিজের ঘরে সে "কেলেঙ্কারী" টেনে আনতে রাজী নয়। এতে বোন বখে যাবে।

অসংকোচে অলোকা বলতে লাগলো তার জীবনকথা। দু'-মিনিটের পরিচয়ে নিজের গোপনতর রহস্যকে এমন ভাবে উদ্‌ঘাটন করতে কোন মেয়েকে শুনিনি। মনে হলো এর সঙ্গে যেন বহু দিনের পরিচয়।

ঝাঁঝালো মেয়ে মাধবদা পছন্দ করেন। কাজেই আলাপ বেশ জমে উঠলো। ইতিমধ্যে গাড়ী এসে পৌঁছল থিয়েটারের ক্লাবে। মহড়া দিতে নেমে গেলেন বিমলবাবু, ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন আমাদের গন্তব্যস্থলে নামিয়ে দিতে। অলোকা নেমে গেলো বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে। যাবার সময় ধন্যবাদ জানালে অশেষ। ছোট একটি নমস্কার দিয়ে বললে, 'আবার দেখা হবে।'

মাধবদা নিজের নামের কার্ডটা বের করে দিয়ে বললেন, 'আসবেন একদিন গান্ধী-ক্যাম্পে।'

অলোকা বলে, 'ওখানে যাবো কি করে? কোন পুণ্যই যে অর্জন করিনি নিজের জীবনে!'

'তাতে কি আছে', বলেন মাধবদা, 'পুণ্য করার রেওয়াজ ছিল আদম-ইভের আগে। আজকাল ধারা বদলে গেছে। তাই আসতে পারেন স্বচ্ছন্দে।'

* * *

অলোকার সঙ্গে এর পরে দেখা হয় লেক ময়দানের প্রার্থনা সভায়। ময়দানে লোকে-লোকারণ্য, যাবার কোন পথই ছিলো না। নির্মলদাকে শিখণ্ডী করে কোন রকমে ঢোকা গেলো।

প্রার্থনা সভার কাজ শুরু হ'লো 'রঘুপতি রাঘব' সঙ্গীত দিয়ে। এই গানের পদাবলীর অনেক অদল-বদল হয়েছে। দু'-একটা কলিও সংযুক্ত হয়েছিলো নোয়াখালীতে।

হঠাৎ সভার এক প্রান্তে এক গুঞ্জন উঠলো। কৌতূহল টেনে নিয়ে গেলো আমাদের সেই জায়গায়। মধ্যমবয়সী এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, তাই আপত্তি উঠেছে। করুণ কণ্ঠে মাধবদার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'দেখুন তো, কি অন্যায়! আমি বুড়ো মানুষ, কানে একটু কম শুন্‌তে পাই। একটু আগে গিয়ে বস্‌তে চেয়েছি, এটা কি অন্যায়?'

গলা-খাঁকারী দিয়ে উঠলো পাশের দুটি লোক। তারা বললে, 'ন্যায়-অন্যায় বহুত দেখেছি স্যর, ওসব কারসাজী আর দেখাবেন না। একটু সাইলেণ্ট হয়ে বসে থাকুন।'

মাধবদা বুড়োর প্রতি কৃপা করলেন। হাতজোড় করে বললেন, 'দিন না একটু জায়গা ছেড়ে। বুড়ো মানুষ, একেই তো কষ্ট পাচ্ছে, এক পা এগিয়ে এলে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

পাশের লোকটি বলে, 'তা পেছনে বসলেই বা কি অশুদ্ধ হবে?' কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত রাজী হ'ল জায়গা ছেড়ে দিতে। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

কিছুক্ষণ বাদে আবার সোরগোল উঠলো। এবার দেখতে পাওয়া গেলো ভদ্রলোক তাঁর দুই পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্রকে নিয়ে আসার চেষ্টা করাতে এ নতুন গোলযোগের উৎপত্তি হয়েছে। ভদ্রলোক বলেন, 'নিজের ছেলে দুটোকে কি স্যর আড়ালে রাখতে পারি?' এবারও অনুরোধ রাখা হ'লো। কিন্তু একটু বাদেই আর এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা এগিয়ে আসার চেষ্টা করলেন।

বাধাটা এলো মধ্যমবর্ষীয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে, 'আপনাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই,' ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এখানে নিশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই, আর আপনারা চাইছেন আগে আসতে !'

ঠাট্টা করে বলে পাশের ভদ্রলোক, 'নিজের জায়গার বন্দোবস্ত হয়েছে কি না তাই আস্ফালন দেখানো হচ্ছে।'

ভদ্রলোক চটে যান, 'দেখুন ম'শায়, মুখ সামলে কথা বলবেন।'

বেশ একটু হৈ-চৈ শুরু হলো। ভীড়ের ধাক্কায় ছিট্‌কে প'ড়লাম এক কোণে। হঠাৎ শুনতে পেলাম পাশ থেকে নারীকণ্ঠ, আমার নাম ধরে কে ডাকছে। তাকিয়ে দেখি অলোকা।

জিজ্ঞেস করি, 'আপনি এখানে ?'

'কেন, আপত্তি আছে ? বেলেঘাটার ক্যাম্পে তো যাবার অধিকার নেই, তাই এলাম মহাত্মাজীকে এই ময়দানেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে।'

একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। অলোকার পাশেই বসে পড়লাম। নির্বিঘ্নে কেটে গেল সভা। এর পরে খোঁজ শুরু করলাম মাধবদার। সন্ধান পেতে দেরি হ'লো না। কিন্তু জীপ গাড়ী নিখোঁজ। মাধবদা অলোকার সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলেন, আমি গাড়ীর সন্ধানে বেরুলাম। গাড়ী পাওয়া গেলো লেকের এক প্রান্তে। ফিরে এসে দেখি, মাধবদা অলোকার সঙ্গে আলাপে মগ্ন। আমায় দেখে ব'ললেন, 'আরে, এ যে তোমাদের ঢাকার মেয়ে !'

আমি কিছু বলার আগে অলোকা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় থাকতেন আপনি ? ঢাকার শহরে—উয়ারী, না আরমানীটোলা ?

হেসে বললাম, ‘এ ছুটো পাড়া ছাড়াও যে ঢাকায় বসবাস করবার মতো জায়গা ছিলো। আস্তানা ছিলো গেণ্ডারিয়ায় কিন্তু সময় কাটিয়েছি ঢাকা-হলেই বেশীর ভাগ।’

‘ঢাকা-হলে ?’ অলোকা একটু ঔৎসুক্যের কণ্ঠেই প্রশ্ন করে, ‘আপনি অজয় রায়কে চিনতেন ?’

‘কোন্ অজয় রায় বলুন তো ?’

‘আজকাল আর্মিতে আছে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েই যুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়েছিলো।’

চিনতে দেরী হ’লো না। অজয় আমার বিশেষ বন্ধু ছিলো। ছেলেবেলা বহু দিন কাটিয়েছি একসঙ্গে। কলেজে পিং-পং খেলতাম দিন রাত। প্রতি শুক্রবার কলেজ কামাই করে যেতাম লায়ন সিনেমায় ম্যাটীনিতে ‘বাহাত্বরের’ খেলা দেখতে। বললাম, ‘অজয় আমার বিশেষ বন্ধু। শুনেছি ও আজকাল দিল্লীতে আছে। আপনার কি দরকার বলুন তো ?’

অলোকা বললে, ‘আমারও চেনা, তাই জিজ্ঞেস করলুম। আমি আরমানীটোলা পাড়ার মেয়ে। অজয় জগন্নাথ কলেজে মামার ছাত্র ছিলো, তাতেই আলাপ-পরিচয়।’

অলোকার কথার ভঙ্গীতে মনে হ’লো কি যেন ও চেপে গেলো। আমি আর কথায় জোর দিলাম না। মাধবদা কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

* * *

কিছুদিন পরে দিল্লী থেকে ডাক এলো গান্ধীজির। পাঞ্জাব ও দিল্লীতে তখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আগুন জ্বলছে। পাঞ্জাব ছেড়ে আসছে প্রতিদিন হাজার-হাজার হিন্দু নর-নারী। সঙ্গে তারা বয়ে

আনছে তাদের মর্মন্তুদ কাহিনী। সেই কাহিনী ইন্ধন যুগিয়েছে দিল্লীর হাঙ্গামায়। প্রতিদিন বহু মুসলমান দিল্লীতে হচ্ছে আশ্রয়হীন। কতো লোক বিসর্জন দিচ্ছে প্রাণ।

যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। স্থির হ'লো গান্ধীজি ট্রেন ধরবেন মাঝ রাস্তা থেকে, আমাদের আয়োজন অবশ্য হ'লো হাওড়া স্টেশন থেকেই।

স্টেশনে অলোকা এসেছিলো। গাড়ী ছাড়ার তখন বহু বাকী। তাই আলাপ বেশ জমে উঠলো। হঠাৎ অলোকা জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি দিল্লী যাচ্ছেন, অজয়ের সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয় ?'

অবাক হলাম প্রশ্নটা শুনে, কারণ অজয়ের কথা হঠাৎ উঠবে এ আশা করিনি। তবু নিজের কৌতূহলকে চেপে রেখে জবাব দিলাম, 'হয়তো হতে পারে। কিন্তু ওর দিল্লীর ঠিকানা যে আমার জানা নেই, আপনি জানেন কী ?'

'হ্যাঁ, অজয় আছে ওয়াই. এম্. সি.তে, জয়সিংহ রোডে। যদি দেখা হয়…।'

অলোকা তার কথা শেষ করলো না। মনে হ'লো যেন কি ও লুকোতে চাইছে। ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠলো। অলোকা আমার দিল্লীর ঠিকানা লিখে নিলো।

গাড়ী ছেড়ে দিলো।

ট্রেনে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুম এলো না। মাঝে-মাঝে স্টেশনে গাড়ী থামলো, সেই সঙ্গে এলো বিরাট জনতা। রাত্রিবেলা বলে তাদের উৎসাহ দমে যায়নি, তারা এসেছে রীতিমতো প্রসেশন্ করে। বিপুল জয়ধ্বনি স্টেশনের নিস্তব্ধতা ভেদ করে তুললো। তারা চাইলে—গান্ধীজির দর্শন কিন্তু মহাত্মাজীর তখন গভীর ঘুম।

স্টেশনে মাধবদার তৃষ্ণা পেলো, সামনেই ছিলেন স্টেশনের এক কর্মচারী। জলের জন্যে ইশারা করতেই নিয়ে এলেন জল, সেই সঙ্গে আনলেন সীতাভোগ, মিহিদানা।

'এ কী করেছেন? আমি মাত্র জল চেয়েছিলাম,'—মাধবদা বললেন।

মৃদু হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আপনারা গান্ধীজির লোক, আপনাদের জন্যে একটু আয়োজন করেছি, এ আর বেশী কি?'

তার পরেই একটু আড়ালে ডেকে বলেন, 'বাপুজীর সঙ্গে দেখা হবে কি?'

'সে কি করে সম্ভব উনি যে ঘুমুচ্ছেন।'

'থাক্, থাক্, তাঁকে আর বিরক্ত করে লাভ নেই। আমার ওঁর সঙ্গে আলাপ আছে কি না, তাই দেখা করতে চেয়েছিলুম।'

সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ, চিনতুম বটে এককালে, ছোটবেলায়। বাবা ছিলেন সত্যাগ্রহী, সেই সূত্রেই পরিচয়টা হয়েছিলো। তবে বহু দিনের পুরানো কথা। আর ম'শায়, আজকাল কী কেউ আর সে সব কথার মূল্য দেয়? স্টেশন-মাস্টারকে বলেছিলুম একদিন এ কথা। সেই শুনে ব্যাটা আমার উপর বড্ডো জেলাস হয়ে আছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে আমার নামে লাগিয়েছে ডি. টি. এসের কাছে। তার ফলে হয়েছে প্রমোশনের জায়গায় ডিমোশান। এই তো আমাদের বাঙালী-চরিত্র! কারু ভালো সইতে পারে না।'

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গাড়ী ছেড়ে দিল।

* * *

ট্রেনে ক'লকাতার স্মৃতি আমার মনে পড়তে লাগলো। এ নগরীর সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয়, বিশেষ করে সাংবাদিক হিসেবে। শহরের অলি-গলির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কখনোই গাঢ় হয়ে ওঠেনি। তবু এই অল্প পরিচয় আমাকে বেশ মুগ্ধ করেছিলো। বিদেশে বন্ধুদের যখন এ কথা বলেছি, তাঁরা বলেছেন, 'ওটা তোমার হোম সীক্‌নেস।' কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে ওটা সীক্‌নেসের চাইতে প্রবল, ওটা প্রীতির টান। এই বিরাট মহানগরীতে প্রতিদিন হাজার-হাজার লোক, রোজই তারা আসতো সোদপুরে, বেলেঘাটায়, বা প্রার্থনা সভায়। তাদের মধ্যে ছিলো আবেগ, ছিলো উচ্ছ্বাস। পুঞ্জীভূত দুঃখকে ভুলবার চেষ্টা করতো তারা ক্ষণিকের জন্যে প্রার্থনা সভায়।

প্রবাসে অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবেরা বিদ্রূপ করে বলতেন, 'তোমরা বাঙালীর জাত ইমোশনাল। এটাই হচ্ছে তোমাদের সমস্ত দুঃখের সিক্রেট। তোমরা যেমনি অক্লেশে অকাতরে বরণ করে নাও কোন নতুন চিন্তাধারাকে, তেমনি তাকে বর্জন করতে কুণ্ঠাবোধ করো না। যে কামনাকে পূরণ করতে তোমারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছো তাকে তোমরা সহজেই অবজ্ঞায় পদদলিত করেছো। তোমরা জিনিসের মূল্য দিতে জানো, কিন্তু যখন পাও, তখন তার মর্যাদা দিতে পারো না।'

এই বিদ্রূপের প্রতিবাদ কখনো করিনি। বরং বলেছি, 'এটাই আমাদের গর্ব যে আমরা পাকা জহুরী। গিল্টী সোনার পেছনে আমরা কখনো যাই নে।' পরে ভেবে দেখেছি যে সমালোচকেরা সত্যি কথাই বলেছেন। আমরা জিনিসের মূল্য দিয়েছি কিন্তু সম্ভবত মর্যাদা দিইনি। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইংরাজ প্রথমে এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা আনলেন আমরাই প্রথমে তাকে বরণ করে নিয়েছিলাম।

আমরা তখন ইংরাজী শিক্ষাকে নকল করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু হঠাৎ যখন দেশে স্বাদেশিকতার বন্যা এলো তখন আমরা হ্যাট-কোট-টাইকে আগুনে দিয়েছি। ইউনিয়ন জ্যাকের প্রতি আমাদের প্রীতি ও ঘৃণা দুই-ই সমান ছিলো বলতে হ'বে। এর পরে দেখেছি দেশনেতাদের অভ্যুদয়। সেকালে স্বদেশীটা আমাদের একচেটিয়া ছিলো, যেমনি ছিলো সরকারী চাকুরী পাওয়াটা। কিন্তু এর পরে দলের নেতা হলেন অবাঙালী। আমাদের মন বিগড়ে গেল। যে প্রতিষ্ঠানকে আমরা নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলাম, তাকে চাইলাম ভেঙে ফেলতে। কেন হ'লো? বহু দিন ভেবে দেখেছি এই প্রশ্নটা, কিন্তু এর সমাধান মেলেনি। আমার মনে হয়েছে যে আমাদের পরকে তাড়াতাড়ি আপন করে নিয়ে ভালোবাসার ক্ষমতা যেমনি, তেমনি আবার ঘৃণা করার শক্তিও প্রবল। আমাদের উন্নতির এটাই হয়েছে সব চাইতে বড়ো প্রতিবন্ধক। তাই ক'লকাতায় গান্ধী-ক্যাম্পে এতো উচ্ছ্বাস-আবেগের মধ্যে যেন দেখতে পেয়েছি অসংখ্য নর-নারীর মধ্যে যেন কিসের অভাব।

গান্ধী-ক্যাম্পে আমাদের এই দৈন্য বেশ চোখে পড়লো। আমাদের গান্ধী-প্রীতি অনেকটা জোয়ার-ভাঁটার মতো চলেছে। তাঁর প্রতি আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে ক্ষণে-ক্ষণে। তাই প্রথম যেদিন ক্যাম্পে দেখ্‌তে পেলাম উচ্ছৃঙ্খল জনতা, সেদিন অবাক হইনি কিন্তু পরদিন হাঙ্গামাকারীরা যখন এসে স্বেচ্ছাসেবক হ'লেন, সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম। আবার যখন এরা এসে একদিন গভীর রাত্রে ক্যাম্পে হানা দিলেন সেদিন হাসি পেয়েছিল।

পাঁচ

ট্রেন যখন দিল্লী-শাহাদরায় এসে পৌঁছল তখনো প্রভাত হয়নি। তবু অন্ধকারের আলোয় দিল্লীর হাঙ্গামার পেলাম ক্ষীণ আভাষ। প্ল্যাটফর্মে জনতার কোলাহল নেই, নেই কুলীর হাঁক-ডাক বা চা-গ্রামের কণ্ঠস্বর। এই নির্জনতা ভয়াবহ, এই আবহাওয়া স্মরণ করিয়ে দেয় এদিকের জগৎ যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

দিল্লী স্টেশনে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন গম্ভীর। নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, অমৃত কাউরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখে-মুখে তাঁদের ফুটে উঠেছে চিন্তার ধারা।

এবার গান্ধীজি আতিথ্য গ্রহণ করলেন আলবুকর রোডে, শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লার বাড়ীতে।

ভাংগী কলোনী ছিলো মহাত্মাজীর প্রিয় স্থান। এইটাই ছিল তাঁর দিল্লীর পান্থশালা। কিন্তু এবারের স্থান পরিবর্তনের মুখ্য কারণ দিল্লীর সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া। রাস্তার অলিতে গলিতে চলেছে মৃত্যুর হোলী খেলা। ভাংগী কলোনীতে পর্যন্ত আর শান্তি নেই, তাই প্রয়োজন হয়েছে স্থান পরিবর্তনের।

যখন গান্ধীজি ভাংগী কলোনীতে থাকতেন তখন সেটাই হতো ভারতের রাজনীতির কেন্দ্র। তাঁর আগমনের বহু আগে থেকেই চলতো আয়োজন, সরঞ্জাম। জঞ্জাল, আবর্জনা হতো দূর। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় কলোনী হয়ে উঠতো উদ্ভাসিত। রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে থাকতো নতুন মডেলের মোটরগাড়ী। তাই একবার

ঠাট্টাচ্ছলে সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন, ইফ বাপু অন্‌লি নিউ দি কস্‌ট অব সেটিং হিম ইন পোভার্টি।

প্রথম দিনের বিকেলের প্রার্থনা সভা তেমনি জমলো না। শ্রোতার ছিল অভাব। কিন্তু যাঁরা শুনলেন তাদের মনে দাগ কাটলো গান্ধীজির কথা।

ইতিমধ্যে ক্রমেই দিল্লীর সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া তীব্র হয়ে উঠলো। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণ নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হলো। কেউ-কেউ বললেন যে দেশ ভাগই এ হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে, হাঙ্গামার জন্যে দেশ ভাগ হয়নি। কিন্তু হাঙ্গামা যে অবশ্যম্ভাবী এর আভাষ বহু পূর্বে দিয়াছিলেন লীগের প্রেসিডেণ্ট কায়েদ-ই-আজম জিন্না। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে তিনি এর ইংগিত করেছিলেন। শাসিয়েছিলেন ভাইসরয়কে যদি ভারতের সমস্যা সমাধান লীগের আশানুযায়ী না হয় তবে দেশে গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে।

শুধু জিন্না সাহেব নন, তার অনুচরবর্গও এই গোলমালের আভাষ দিয়েছিলেন বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে। একদিন দিল্লীতে মার্কিন সাংবাদিক আলফ্রেড ওয়াগের কাছে মুসলীম লীগ নেতা মোহাম্মদ ইসা বলেছিলেন, ১৬ই আগস্ট কলকাতায় হবে আতসবাজীর খেলা। যেদিন এই আতসবাজীর খেলা হলো সেদিন এতে কোন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিল না, ছিল রক্তের কণিকা।

পনেরোই আগস্ট। দেশ হলো স্বাধীন, কিন্তু হাজার হাজার লোক হলো গৃহহীন। পাঞ্জাব থেকে শুরু হলো শরণার্থীর মিছিল। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে র‍্যাডক্লিফের ঘোষণা কিন্তু সে ঘোষণা কাউকে

করেনি সন্তুষ্ট। পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়েছে দেরুদাসপুর। তাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন লিয়াকৎ আলী।

দেশের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর ইভান জেংকিস। জেংকিস ঝানু অফিসার, তাঁর প্রতি উপশিরায় বইছে কনসারভেটিজ্‌মের রক্ত।

দেশভাগ হবার কিছুদিন আগে জেংকিস রাজপ্রতিনিধিকে চেতাবাণী দিয়েছিলেন দেশের গৃহবিবাদ সম্বন্ধে! কিন্তু যখন শুরু হলো পাঞ্জাবে দাঙ্গা তখন তা নির্মূলে দমন করার কোন চেষ্টা তিনি করেন নি। হয়তো সে আগ্রহই তাঁর ছিল না। তাই পাঞ্জাবে যখন শুরু হলো হত্যার তাণ্ডবলীলা তখন দেশের সবাই বিস্মিত বা চিন্তিত হলেও ইংরেজ সরকার বিচলিত হলেন না।

দিল্লীতে এসে যখন শরণার্থীর মিছিল পৌঁছল তখন দিল্লীর রাজপথ রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো। অলিতে গলিতে পড়ে রইলো অজানা পথিকের মৃতদেহ। তাদের মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে উৎকট গন্ধ।

ওদিকে পাঞ্জাব থেকে রোজই আস্‌ছে জনস্রোত। নিঃসম্বল, আশ্রয়হীন, ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজধানীর এদিক ওদিক। উচ্ছেদ হয়েছে তারা তাদের পৈতৃক ভিটা থেকে। এ শোক তারা সহজে মুছে ফেলতে পারেনি। তাই যখন পেলো সুবিধে, নিলো তার প্রতিশোধ। অতি সহজেই তারা করে দিল দিল্লীর শাসনভার পঙ্গু। বেপরোয়া, এরা মরতে ভয় পায় না, সংকোচ করে না পুলিশের কাছে হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে আসতে। অতএব সরকার বাধ্য হয়ে তলব করলেন সৈন্যবাহিনীর। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তনই এতে হলো না।

গোলমাল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেন গঠন করলেন এক এমার্জেন্সী কমিটি। এতে রইলেন নেহেরু, প্যাটেল, মাথাই ও বলদেব সিং। শহরের শান্তি ফিরিয়ে আনাই এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, যারা গৃহহীন, আশ্রয়হীন, শহরে এদিকে-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের সংস্থান করাও ছিল এঁদের কাজ। এদের তত্ত্বাবধান করার জন্যে সৃষ্টি হলো নতুন দপ্তর, মন্ত্রী হলেন ক্ষিতীশ নিয়োগী।

ইতিমধ্যে অমৃতসহরের অবস্থা হলো আরো ভয়াবহ। শুরু হলো কলেরা, রাস্তার আশে-পাশে পড়ে রইলো মৃতদেহ। পালাতে গিয়ে অনেক মুসলমান প্রাণ দিল। শোনা গেলো রোজই ট্রেন বন্ধ করে আক্রমণ করা হচ্ছে। এমার্জেন্সী কমিটির বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনা শুরু হলো, কী করে বন্ধ করা যায় এই হাঙ্গামা।

তাই সরকার প্রথমে স্থির করলেন যে, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে শরণার্থীদের আর দিল্লীতে আসতে দেয়া হবে না। এদের সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত হলো অন্য জায়গায়। এমার্জেন্সী কমিটির এক বৈঠকে প্যাটেল প্রস্তাব করলেন যে সমস্ত শরণার্থীদের ট্রেন চালু রাখা হোক। এতে রিলিফ ক্যাম্পে শরণার্থীদের চাপ অনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে।

এই বিপদে সবচাইতে বেশী দায়িত্ব নিতে হলো সরকারী কর্মচারীদের। এই সঙ্কটের সময় তাঁরা বিচলিত হননি, বরং কাজ করে গেছেন অম্লান বদনে। এঁদের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের বহু অভিযোগ এসেছে। কমিটির এক বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে এঁদের উৎসাহ দিয়ে নেহেরু ও জিন্না এক বিবৃতি দেবেন। রাজী হলেন নেহেরু কিন্তু বাধা এলো জিন্নার তরফ থেকে। নতুন করে কিছু বলতে তিনি রাজী নন। এর আগে

করাচীতে তিনি সরকারী কর্মচারীদের প্রতি যে উপদেশ দিয়েছেন ওটাই যথেষ্ট।

উদারনৈতিক নেতা পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু হঠাৎ একদিন অভিযোগ আনলেন ইংরেজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। নালিশ করলেন যে এই হাঙ্গামার জন্যে অনেকটা দায়ী ইংরেজ কর্মচারী ও ইংরেজ সৈন্যরা। দৃষ্টান্ত দিলেন তিনি শেখপুরার এক ঘটনা।

কুঞ্জরুর বিবৃতি ইংরেজমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। আপত্তি এলো মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে। মীমাংসার ভার পড়লো গান্ধীজির উপর। তিনি রফা করলেন যে কুঞ্জরু তাঁর বিবৃতির প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু লর্ড ইস্‌মে নাছোড়বান্দা। এতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। কাজেই ইংরেজ কর্মচারীদের তারিফ করে নেহেরু নিজেই বিবৃতি দিলেন।

*   *   *

বিড়লা বাড়ীর প্রাঙ্গনে দৈনন্দিন হতো প্রার্থনা সভা। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাই ছিল জনসমাগমের প্রতিবন্ধক। তাই মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন গান্ধীজির কাছে যে তাঁর বক্তৃতা অল ইণ্ডিয়া রেডিও মারফৎ প্রচার হবে। পন্থা অতি অভিনব। বিশেষ করে রেডিও মারফৎ বক্তৃতা প্রচারে গান্ধীজির আপত্তি ছিল। স্টুডিওতে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হবে থিয়েটার করার সামিল। এটাই তাঁর মত। কখনো তিনি বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে বক্তৃতা করেন নি। তাই সহজে এই প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। শুধু আশ্বাস দিলেন মাউণ্টব্যাটেনকে যে এই প্রস্তাব তিনি চিন্তা করে দেখবেন।

দিল্লীর ও পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড গান্ধীজিকে ব্যথিত করে তুলেছিল। এতে তাঁর ব্লাড্‌প্রেসার বৃদ্ধি পেল। ডাক্তারেরা চাইলেন তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে কিন্তু তিনি আপত্তি তুললেন। বাইরের জগতের কথা তিনি প্রায় একদম ভুলে গেলেন। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে শুরু করলেন দিল্লীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজ।

দিল্লীর একপ্রান্তে শহরতলী ওখলা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে জামিয়া-মিলিয়া, মুসলমানদের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বহু মুসলমান আতঙ্কিত হয়ে সেখানে জড়ো হয়েছে। পালা করে পাহারা দিচ্ছেন শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকগণ। গান্ধীজি নিজে কয়েকবার গেলেন ওদের তত্ত্বাবধান করতে।

আর একদিন গভীর রাত্রে। জামিয়া-মিলিয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো এক মোটর গাড়ী। সবাই উদগ্রীব হয়ে তাকালো। গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন পণ্ডিত নেহেরু। সবাইকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি সেই রাত্রি আতঙ্কিত শরণার্থীদের সঙ্গে বাস করবেন।

শুধু তাই নয়। গান্ধীজি ও পণ্ডিত নেহেরু শহরের চারদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গান্ধীজি নিজে তত্ত্বাবধান করলেন শরণার্থীদের ক্যাম্প। এদের প্রতি তিনি তাঁর প্রার্থনা সভার বক্তৃতায় সহানুভূতি জানালেন।

সরকারের শিবির পড়লো দিল্লী নগরীর বাইরে। শরণার্থীদের তত্ত্বাবধান সেইখান থেকে শুরু হলো। তাদের কাছে আবেদন করা হলো শহরের বাইরে থাকবার জন্যে।

প্রার্থনা সভায় গান্ধীজি বার-বার বললেন: হিংসার প্রতিশোধ প্রতিহিংসায় মেলে না। তিনি বললেন, দেশবাসীর কর্তব্য ভারতীয় মুসলমান নাগরিকদের মনে শান্তি ফিরিয়ে আনা।

তারপর একদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের এক সভায়। গান্ধীজি স্বয়ং সেবক সদস্যদের কাছে আবেদন করলেন, বললেন, যে নিজে অপরাধী সে অন্যকে সাজা দিতে পারে না। দোষীকে সাজা দেবার অধিকার দেশের সরকারের, জনসাধারণের নয়।

*   *   *

সেদিনকার প্রার্থনা সভায় শ্রোতা ছিল অনেক। তাই সভা থেকে বেরুতে কষ্ট হলো।

দিল্লী হচ্ছে রাজার শহর। এখানে আমীর-ওমরাহ্‌রা চড়েন রথে, আধুনিককালে যাকে বলা হয় মোটর গাড়ী। পদব্রজই প্রজাদের পথ অতিক্রম করার একমাত্র অবলম্বন। সেটা শুধুমাত্র দপ্তরে যাবার জন্যেই নয়, ব্রজধামে যাবার পক্ষেও শ্রেষ্ঠ। অবশ্য সঙ্গে যদি রাধিকারা থাকেন।

আমার ভাগ্যে সেদিন ট্যাক্‌সী-বাস কিছুই মিললো না। অতএব হেঁটেই রওনা হওয়া গেল দপ্তরের পানে। উইলিংডন এয়ার পোর্টের কাছে এসে পেলাম এক এয়ার কোম্পানীর বাস। গাড়ী থামানো গেল, ভেতরে ছিলেন এক বৃদ্ধ পাইলট। আমার দুরবস্থার কাহিনী শুনে তাঁর সহানুভূতি হলো। তিনি সানন্দে আমায় তাঁর গাড়ীতে আহ্বান করলেন।

গাড়ী চল্‌তে শুরু করলো, হঠাৎ কিছুক্ষণ বাদে স্পষ্ট বাংলায় শুনতে পেলাম নিজের নাম। তাকিয়ে দেখি অজয়।

অজয়ের সঙ্গে এম্নি অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হবে সেটা ছিল কল্পনার বাইরে। তাই একটু অবাক হ'লাম। জিজ্ঞেস করলাম, সে কিরে? তুই এখানে কবে এলি?

বাঃ রে এতো আমার কোম্পানীর বাস। প্লেন নিয়ে গিয়েছিলাম কাশ্মীরে, এইমাত্র ফিরে আস্‌ছি।

অজয় আলাপ করিয়ে দিলো তার সহকর্মীদের সঙ্গে।

ওয়েস্টার্ন কোর্টের কাছে গাড়ী থেকে উতরানো গেল। অজয় আমায় নিয়ে এলো আল্লসে। তারপর খুলে বসলো বিয়রের বোতল। সেই সঙ্গে বলতে লাগলো তার মনের কথা।

বললো : তোর কথা শুনেছি অলোকার কাছে। চারদিন আগে প্লেন নিয়ে গিয়েছিলুম ক'লকাতায়। অলোকা তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হেসে জবাব দিলাম। বললাম : যারা গুণী তাদের সবাই করে নিন্দা। যাদের নেই প্রতিভা তাদের ভাগ্যে জোটে প্রশংসা। তাই অলোকার প্রশংসাবাণী শুনে নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে শঙ্কা হচ্ছে। তারপর তোর কথা ব'ল দিকিনি। এয়ার ফোর্স ছাড়লি কবে? শুনেছিলুম কোহাট না কোথায় আছিস্?

হ্যাঁ, সে এক বিরাট কাহিনী। সাহিত্যিক নই, নইলে লিখতুম আরব্য উপন্যাস। বর্মা থেকে স্কোয়াড্রন বদলী হলো কোহাটে। সেই সঙ্গে চলে গেলাম। কিছুদিন বাদে স্কোয়াড্রনের বন্ধুবান্ধবেরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। মন টিকলো না কোহাটে, তাই ছেড়ে দিলাম এয়ার ফোর্স। ভাগ্য সুপ্রসন্নই ছিল বলতে পারিস। চাকরী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাজ জুটে গেলো এই এয়ারওয়েজ কোম্পানীতে।

অলোকার কথা তুললে অজয়। ওর পরিচয়ের একটা ইতিহাস দিলে। যে পরিচয় আজ প্রেমে এসে দাঁড়িয়েছে।

মনে অনুসন্ধিৎসা জাগলো। তাই প্রশ্ন করলাম যে বিয়ের সম্ভাবনা আছে কিনা।

অজয় একটু থতমত খেয়ে গেলো। তারপর বললে, অলোকাকে আমি ভালোবাসি। বহুবার বিয়ের কথা অলোকা আমায় বলেছে। কিন্তু নিজের মনকে সায় দেওয়াতে পারিনি। নিজের এই দুর্বলতা কাটিয়ে নিয়ে বহুবার চেষ্টা করেছি বিয়ে করার, কিন্তু পারি নি।

বললাম, এ তোর অন্যায়। যদি সত্যিই তুই ওকে ভালোবাসিস তা হলে তোর বিয়ে করা উচিত।

বিয়েতে কোন বাধা ছিলো না, অজয় বলতে লাগলো, কিন্তু জানিস্ কি হলো এয়ার ফোর্স ছাড়ার কিছু দিন আগে? এক ঘটনা ঘটলো যা আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। সে ঘটনা আমার মনে দাগ কেটেছে। যখনই ও-কথা মনে হয়, তখনই আমি বিয়ে করতে ভয় পাই।

অজয় বললো সে কাহিনী।

বর্মা যুদ্ধ শেষ হবার কিছু দিন আগে। স্কোয়াড্রনে তার প্রিয়বন্ধু ছিল তেলাঙ্গ। জাতে মহারাষ্ট্রীয়। তেলাঙ্গ ছিল বেজায় আমুদে লোক। অফিসারস্ মেসে সবাই তাকে ভালোবাসতো। লড়াই শেষ হবার ঠিক কিছুদিন আগে তেলাঙ্গ বিয়ে করলে। সমস্ত মেসে খুব হৈ-চৈ হলো। কিন্তু এ আনন্দ রইলো ক্ষণস্থায়ী। একদিন অজয় আর তেলাঙ্গ চলে এলো লাহোরে। এক একজিবিশনের আয়োজন হয়েছে সেখানে। শূন্য আকাশে খেলা দেখানো হবে নানান্ রকমের। তেলাঙ্গ আর অজয় এতে অংশ নেবে।

একজিবিশনের দিন ভোর বেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে তেলাঙ্গ অজয়কে বললো তার স্ত্রীর কথা। বললে একজিবিশন হয়ে গেলেই ও ছুটি নিয়ে হনিমুনে যাবে।

একজিবিশন শুরু হলো। তেলাঙ্গ আর অজয় প্লেন নিয়ে

দেখালো নানান রকম কসরৎ। শেষের দিকে তেলাঙ্গ একাই নিয়ে গেলো প্লেন। প্রায় দশ হাজার ফিট উঁচুতে। হঠাৎ উপরে মেসিন বিগড়ে গেলো। প্লেন দ্রুতগতিতে নীচে নেমে এলো ডিগবাজী খেতে-খেতে। যারা দর্শক তারা ভাবলে যে এটাও একটা কসরৎ, কিন্তু বুঝতে পারলে অজয় যে মেসিন বিগড়ে গেছে। রেডিওতে বলা হলো তেলাঙ্গকে 'বেল আউট' করতে। কিন্তু জবাব পাওয়া গেলো না। অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রইলো—কিন্তু য়্যাক্সিডেণ্ট এড়ানো গেলো না।

য়্যাকসিডেণ্টের পরও কিছুক্ষণ তেলাঙ্গ জীবিত ছিলো। হঠাৎ একটু জ্ঞান হয়েছিলো। ডাক্তার কথা বলতে দেননি কিন্তু অজয় বুঝতে পেরেছিলো যে ও স্ত্রীর কথা বলতে চায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না।

কাহিনীটা বলতে বলতে অজয়ের চোখে জল এসে পড়লো। বললে, জীবনে অনেক ছেলে দেখেছি কিন্তু কখনো তেলাঙ্গের মতো কাউকে পাইনি। ওর সাহস দেখেছি অদ্ভুত! বর্মায় জেনারেল উইংগেটকে খাবার সরবরাহ করতে গিয়ে একবার জাপানীদের খপ্পরে পড়ে। কিন্তু পালিয়ে আসে। তেলাঙ্গ কোন দিন মৃত্যুকে ভয় পায়নি। কিন্তু মৃত্যু তার এলো যখন সে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলো। এর পরে বহু দিন সে মনে করেছে তেলাঙ্গের স্ত্রীর কথা। ওদের মিলন হয়েছিলো মাত্র দু'দিনের জন্যে। বিবাহিত জীবন কি তার কোন স্বাদই ওরা পায়নি। মনে ছিলো ওদের নানা রঙীন কল্পনা। কিন্তু সে কল্পনা কোন দিনই তাদের বাস্তবে পূর্ণ হয়নি।

অজয় বললো, নিজের বিয়ের কথা যখনই ভেবে দেখেছি তখনই আমার তেলাঙ্গের কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে তেলাঙ্গের সদ্য-পরিণীতা স্ত্রীর কথা। জীবনের সমস্ত সুখ থেকেই আজ সে হয়েছে

বঞ্চিত। কেন? এমনি ভাবে আমারও হয়তো একদিন জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন হয়তো অলোকার জীবন হবে এমনি দুঃখময়। তাই দ্বিধা হয় নিজের জীবনের সঙ্গে অন্যকে জড়িয়ে রাখতে। যদি আমি থাকি ছন্নছাড়া, তবে আমার মৃত্যু এ জগতে কোন পার্থক্য এনে দেবে না।

অজয় বলে চললো, মরতে আমি ভয় পাই নে। আর মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করতে পারতাম বলেই এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন দেখতে পাই নিজের জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখনই মরতে সংকোচ হয়।

কথা বলতে বলতে বেশ রাত্রি হয়ে গিয়েছিলো। আল্লস থেকে বেরিয়ে দুজনে কনট সার্কাসে এলাম। অজয় বললে যে তার পরদিন ভোর বেলাই আবার প্লেন নিয়ে বেরুতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলো আবার দেখা করবার।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিলো। পার্লামেণ্ট স্ট্রীট ধরে অফিসে চলে এলাম। মনে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো অজয়ের কথা। মনে হলো, মৃত্যু তাকে আজ আতঙ্কিত করে তুলেছে। তাই সে দ্বিধা বোধ করছে কোন বন্ধনে আটকা পড়তে।

সত্যিই কি এটাই একমাত্র কারণ?

* * *

কিছু দিন বাদে গান্ধী-আশ্রমে জোর গুজব উঠলো যে, গান্ধীজি পাঞ্জাবে যাবেন। এ গুজবের সত্যতার কোন যাচাই হলো না। একদিন বিকেল বেলা গান্ধীজি দিল্লী সেনট্রাল জেলে গেলেন তাঁর প্রার্থনা সভা করতে। কয়েদীরা সবাই এলো প্রার্থনা সভায়। তাদের গান্ধীজি বললেন, আমি হচ্ছি পুরোনো কয়েদী। তার পর

তিনি বিশ্লেষণ করলেন যে স্বাধীন ভারতে কয়েদখানা থাকবে হাসপাতালের মতো। যেমনি রুগীর চিকিৎসা করা হয় তেমনি করা হবে কয়েদীদের চিকিৎসা।

একদিন একদল শরণার্থী লেডী মাউন্টব্যাটেনের মারফৎ খবর পাঠালো যে তারা গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। কিন্তু সময়ের ছিল অভাব, কারণ তখন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠক চলছিলো। তাই গান্ধীজি রেডিও মারফৎ তাদের বাণী পাঠালেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সেবক মাত্র। সেই হিসাবে আমার কর্তব্য তোমাদের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া। যদি তোমরা তোমাদের দোষ-ত্রুটি শুধরে নিতে পারো, তাহলে তোমরা শুধু নিজেদেরই উপকার করবে তাই নয়, সমস্ত দেশেরই উপকার করবে।

* * *

পনেরোই নভেম্বর, গান্ধী-ক্যাম্পে চাঞ্চল্য উঠলো। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আচার্য কৃপালনী পদত্যাগ করেছেন। নেহেরু-প্যাটেলের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করলেন। কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে এঁরা তাঁর কোন পরামর্শই নেননি। কৃপালনী গান্ধীজির পূর্ণ সমর্থন পেলেন। তিনি বললেন যে এই অবস্থায় কৃপালনীর পদত্যাগই শ্রেয়।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল নতুন প্রেসিডেন্ট ঠিক করার জন্যে। এ দিনটা ছিলো গান্ধীজির মৌন দিবস। তাই ছোট একটি কাগজে তিনি তাঁর মনোনীত প্রার্থীর নাম লিখে পণ্ডিত নেহেরুর হাতে দিলেন। পণ্ডিতজী সভায় পড়লেন সেই নামটি। গান্ধীজি সোস্যালিস্ট নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেওর নাম প্রস্তাব করেছেন। নেহেরু এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন কিন্তু আপত্তি করলেন অন্যান্য

মেম্বারেরা। তাঁরা অনুরোধ করলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেস সভাপতি হবার জন্যে। গান্ধীজির কোন মত নেওয়া হলো না।

বিকেলের দিকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি জানালেন নেহেরু-প্যাটেলের সিদ্ধান্তের কথা। স্পষ্ট ভাষায় গান্ধীজি বললেন যে, এ প্রস্তাব তাঁর পছন্দসই নয়। বেগতিক দেখে রাজেন্দ্রপ্রসাদ অস্বীকার করলেন কংগ্রেস সভাপতি হতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মত পাল্টালেন, কংগ্রেস সভাপতি তিনি হলেন গান্ধীজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

গান্ধীজি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে আবার হার স্বীকার করলেন।

* * *

প্রেস রিপোর্টারদের কাছে তখন সব চাইতে টাটকা খবর ছিল কাশ্মীর।

মাত্র কিছু দিন আগে দিল্লীতে খবর পৌঁছেছে যে নর্থ-ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ারের আফ্রিদিরা কাশ্মীর আক্রমণ করেছে। পাকিস্তানের কাগজে বেরিয়েছে এক ছড়া। 'হস্ হস্ কে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।' প্রবাদ ছিলো যে আফ্রিদিদের বলা হয়েছে যে 'জমিন আউর জায়দাদ হ্যায় পাকিস্তানকী আউর আউরাৎ হোগী তুমহারী।'

কাশ্মীর আক্রমণের খবর দিল্লীতে একটু দেরীতে পৌঁছলো। এতে একটু বুদ্ধির খেলা খেললেন পাকিস্থান সরকার। লাহোর এসোসিয়েটেড প্রেসের ম্যানেজার খবর পেয়েছিলেন অনেক দিন আগেই। কিন্তু খবরটা তিনি চেপে গেলেন পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে, কারণ শঙ্কা হলো যে খবরটা পাকিস্তান থেকে প্রচার হলে সবাই পাকিস্তানকে দোষী করবে।

দিল্লীতে এক ব্যুফে ডিনারে পণ্ডিত নেহেরু সর্বপ্রথম কাশ্মীর আক্রমণের কথা জানালেন। দু'দিন বাদে ডিফেন্স কমিটির বৈঠকে জেনারেল লকহার্ট এক টেলীগ্রাম পড়লেন। টেলীগ্রামটা পাঠিয়েছে পাকিস্থান আর্মি হেড কোয়ার্টার, এতে বলা হয়েছে যে প্রায় পাঁচ হাজার আফ্রিদি কাশ্মীর আক্রমণ করেছে।

কাশ্মীর আক্রমণ নেহেরু-প্যাটেলকে চিন্তিত করে তুললো। কিন্তু পরামর্শ দিলেন মাউন্টব্যাটেন। যদি কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে ইচ্ছে করে যোগ না দেয় তবে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সমীচীন হবে না, এই তাঁর মত। প্যাটেল পাঠালেন ভি, পি, মেননকে কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। প্রথমে আফ্রিদিদের আক্রমণে কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং গৌর একটু মাত্র বিচলিত হ'ননি। কিন্তু দিনের শেষে যখন খবর পাওয়া গেলো যে অফ্রিদিরা শ্রীনগরের দ্বারপ্রান্তে এসেছে তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সাহায্য চাইলেন ভারত সরকারের। সঙ্গে সঙ্গে শেখ আবদুল্লাকে কারামুক্ত করে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসালেন তাঁকে।

কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো শুরু হলো পরদিন থেকে।

* * *

কাশ্মীরে গোলমাল শুরু হবার দু'দিন বাদে অজয় এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললে, ও কাশ্মীর যাচ্ছে রোজই প্লেন নিয়ে। সরকার সৈন্য ও রসদ পাঠাবার জন্যে সমস্ত কোম্পানীর প্লেন চার্টার করেছেন। তারই একটা প্লেনের ভার ওকে দেয়া হয়েছে।

কাশ্মীর দেখার সুযোগ মিলে গেলো। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে অজয়ের সঙ্গে রওনা হ'লাম শ্রীনগরের উদ্দেশে।

যুদ্ধের চিহ্ন দেখতে পেলাম শ্রীনগরের প্রতি অলি-গলিতে। যুদ্ধের বেশে ঘুরছে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ভলান্টিয়ারেরা। দেশ রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে ছেলে-বুড়ো সবাই।

এদিকে দিল্লীতে বৈঠক বসেছে নেহেরু-লিয়াকতের। দুই পক্ষ থেকেই অভিযোগ হলো কিন্তু নেহেরুর যুক্তির কাছে লিয়াকতের হার স্বীকার করতে হলো। মধ্যস্থ হলেন লর্ড ইস্‌মে।

কনফারেন্সে প্রস্তাব করা হলো যে পাকিস্তান আজাদ কাশ্মীর ফৌজদের নিরস্ত করবে। ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীর থেকে তুলে নেয়া হবে—আর ইউনাইটেড নেশনসের মধ্যস্থতায় কাশ্মীরে "প্লেবিসাইট" হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবে প্রথম বাধা এলো সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে। ওয়াকিবহাল সূত্রে তাঁর কাছে খবর এসেছে যে পাকিস্তান তার সীমান্তে অনেক সৈন্য-সামন্ত জড়ো করেছে আক্রমণের উদ্দেশে।

কিছুদিন বাদে ভারত সরকার ঠিক করলেন কাশ্মীর-সমস্যা ইউনাইটেড নেশনসে পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে মাউনব্যাটেন 'তার' পাঠালেন এটলীকে। অনুরোধ করলেন ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। সেই সঙ্গে নেহেরুও 'তার' পাঠালেন এটলীর কাছে। কিন্তু এটলী এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না, বরং সায় দিলেন যে কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের জন্যে ইউনাইটেড নেশনসেই যাবার। কাশ্মীর সমস্যা ইউনাইটেড নেশনসে পাঠানো হলো কিন্তু এবারও গান্ধীজি এ প্রস্তাবে আপত্তি করলেন। সাংবাদিক মহলে এক গুজব রটলো যে গান্ধীজি নেহেরুর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এর সত্যতা প্রমাণ হলো না কিন্তু এর একটু আভাস পাওয়া গেলো হোরেস আলেকজাণ্ডারের কাছে। তাঁর কাছে গান্ধীজি বললেন, যদি দুইদল মীমাংসা না করতে পারে এই সমস্যা, তবে সালিশী মানা হোক

কোন ইংরেজকে। তিনি প্রস্তাব করলেন ফিলিপ্‌ নোয়েল বেকারের নাম।

* * *

একদিন নিজের হোটেলে পরিচয় হলো এক বাঙালীর সঙ্গে। ভদ্রলোক অজয়ের পরিচিত। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ছিলেন ইম্ফলে কনট্রাক্টর, আলাপ সেইখানেই হয়েছিল। ব্রিজ তৈরী না করে অনেক ব্রিজের টাকা সরকার থেকে তিনি আদায় করেছিলেন। সঙ্কোচ যেমনি হয়নি সে পয়সা নিতে, তেমনি অকুণ্ঠায় সেই পয়সা ব্যয় করেছেন। গর্ব করে রেশমের শাড়ীর পাড় কেটে তাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরেছেন। যুদ্ধের সময় দ্বারে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতো গাড়ী। কিন্তু যুদ্ধের শেষে তাঁর স্বচ্ছলতায় ভাঁটা এলো—যে ব্যাঙ্ক তাকে ওভার-ড্রাফট্‌ দিতো তাকে পটল তুলতে হলো।

বন্ধু-বান্ধবেরা সায় দিলেন দিল্লীতে আসার জন্যে। বললেন চাকুরীর বাজার গরম, নসিব থাকলে সহজেই একটা মিলে যাবে।

ভদ্রলোকের নাম আচার্য। চেহারা সুদর্শন, আদব-কায়দায় বলা যেতে পারে স্মার্ট। কাজেই সহজে একটা উপায় বের করে নিলেন নিজের সংস্থানের। পারমিট বার করা, সেইটে হলো তাঁর প্রধান পেশা। সেই সূত্রে পরিচয় হলো দিল্লীর অনেক মহারথীর সঙ্গে। দু'দিনের মধ্যে তিনি হলেন দিল্লীর বিগ গাইদের মোসাহেব। বড়ো-বড়ো ক্লাবের হলেন এক জন মহারথী, ককটেলের হলেন এক্সপার্ট। নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো প্রচুর।

নিজের কাহিনী বলতে বলতে আচার্য একটু দম্ভভরে বললেন, বুঝলেন, ম'শায়, ক্যানটিনের ব্যবসা যখন করেছি তখন এই শর্মার তৈরী কক্‌টেল ছিলো সুপ্রসিদ্ধ। আমার তৈরী করা কক্‌টেল যেতো

বর্মায়। স্বাদ এতোই মধুর ছিলো যে সবাই যুদ্ধের কথা ভুলে যেতো। আর্মি কম্যাণ্ডের জেনারেল টের পেয়ে অর্ডার দিলেন যে আমার তৈরী ককটেল শুধু তাঁকেই দেয়া হবে, আর কাউকে নয়। এই ককটেল উপরওয়ালাদের খাইয়ে জেনারেল ব্যাটাও প্রমোশন পেয়ে গেলো। আচার্য বললো, দিল্লীতে আমার অবস্থা যখন বেশ সঙ্গীন হয়ে এসেছে তখন আলাপ হলো সরকারী দপ্তরের এক বড়কর্তার সঙ্গে। আলাপ হয়েছিলো এক পার্টিতে। আমার টাইয়ের নট্ দেখে বেজায় খুশী হলেন। তারপর ককটেল খেয়ে তো একদম কুপোকাৎ। বললে, ব্রাভো, ব্রাভো। ইউ আর এ ব্রাইট গাই! কী করা হয়?

আচার্য তাঁর সঙ্গীন অবস্থা জানালে। করুণা হলো বড়কর্তার। আশ্বাস দিয়ে বললেন, কুছ পরোয়া নেই। একটা কিছু হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে দেখা করো কাল অফিসে।

বড়কর্তার সঙ্গে পরদিন অফিসে আচার্য দেখা করলে। ঘরে ঢোকা মাত্র বড়কর্তা চেয়ার থেকে উঠে অভিবাদন করলেন। আলাপ শুরু হলো। কথাবার্তায় তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে আলাপে সন্তুষ্টই হয়েছেন। এবার আসল কথা শুরু হলো। বললেন, আই লাইক ইউ আচারিয়া! কি ধরনের চাকরী তোমার পছন্দ?

আচার্য যে কোন চাকরী পেলেই বর্তে যায়। কাজেই বললে, চাকরার ব্যাপারে আমার পছন্দ নেই। কিম্বা যা তুমি দেবে তাই নেবো।

বড়কর্তা জবাব শুনে খুশী হলেন, বললেন, ব্রাইট বয়! আমার মতলব আছে যে আমার অফিসের জন্যে একটা জার্নাল খুলবো। তুমি তার এডিটার হয়ে যাও। মাইনে অবশ্য বেশী নয়, বর্তমানে সাতশো পাবে।

বিস্মিত হলো আচার্য। এই অফারটা বেশ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু বললে, কলম যে কোন দিন ধরিনি, এডিটার হবো কি করে ?

হাসতে থাকেন বড়কর্তা। বলেন, যারা কখনও কলম ধরতে জানে তারা কি কখনও এডিটার হয়? তারা হবে সব-এডিটার। লিখবে ওরা, শুধু কাগজে তোমার নাম থাকবে। তোমার কাজ হবে সুপারভাইজারী। যদি ওরা ভালো লেখে তবে তোমার যশ বাড়বে, যদি খারাপ লেখে তবে 'স্যাক' করবে ওদের।

ধন্যবাদ জানালে আচার্য, চাকরী সম্বন্ধে আরো দু-চারটা উপদেশ বড়কর্তা দিলেন।

আচার্য'র চাকরী পাবার এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আচার্য বললো, জীবনকে কখনো সিরিয়াসলি নিইনি, ম'শায়। যে অন্তঃসারশূন্য তাকেই হ'তে হবে সিরিয়াস। আর তারই দেখেছি জীবনের শেষ হয়েছে ট্রাজেডীতে। তাই যখন যে-ভাবে পেয়েছি তেমনি ভাবে নিয়েছি জীবন। কখনো ঠকিনি বা নিরাশ হইনি। নগদের আশাই সব সময়ে করছি, কখনো দূরের বাদ্যের প্রত্যাশায় থাকিনি।

বাধা দেয় অজয়, জীবনটা ছেলেখেলা নয়। আনন্দের মাঝে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়া উচিত নয়।

হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে আমাদের বিশেষত্ব। জানেন তো 'আত্মা বার্ধক্যে জন্মায় বটে কিন্তু ক্রমেই হয়ে আসে নবীন। এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের কমেডি। কিন্তু জন্মের সময় আমাদের দেহ থাকে নবীন, জীবনের শেষে ওটা এসে দাঁড়ায় বার্ধক্যে। এটাই আমাদের জীবনের ট্রাজেডি।'

জবাব দিই আমি, বলি, আচার্য সাহেব, আপনি সিনিক্ হয়ে গেছেন দেখতে পাচ্ছি।

ভুল বললেন, আমি সিনিক্ নই। যারা সিনিক্ তারা জীবনের মূল্য যাচাই করতে পারে কিন্তু উপভোগ করতে পারে না। আমি উপভোগ করতে পারি বলেই জীবনের দাম যাচাই করতে পারি না। সিনিক্ যদি কাউকে বলতে চান তবে সে হচ্ছে অজয়।

প্রতিবাদ করে অজয়। বলে, সিনিক হওয়া অনেকটা জন্মগত ব্যাপার। দুঃখ পেলেই সিনিক্ হওয়া যায়, কারণ তাহলে দুঃখকে ভোলা যায় অতি সহজে।

আচার্য বলেন, যখন দুঃখকে সহজে ভোলা যায় অজয়বাবু তখনই সিনিক্‌দের হয় মৃত্যু। যাক, আপনার বান্ধবীর খবর কী? বিয়ে কবে করছেন?

অজয় গম্ভীর হয়ে পড়ে। আমি জবাব দিই। বলি, আচার্য সাহেব, আমরা বিয়ে তখনই করি যখন প্রেম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু অজয়ের প্রেমে এখনও অবসাদ আসেনি।

ঠিক বলেছেন, উৎসাহিত হ'ন আচার্য, যতো দিন আমরা প্রেমে মগ্ন থাকি ততোদিন আমরা বিয়ের কথা চিন্তা করি না। এর পরে যখন প্রেমে ভাঁটা শুরু হয়, তখন আরম্ভ হয় প্রেমিক-প্রেমিকাদের মনোমালিন্য। এর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা একে অন্যের আশ্রয় নিই।

হ্যাঁ, তাই যখন প্রেম করি তখন আমরা প্রবঞ্চনা করি নিজেকে। কিন্তু যখন আমাদের প্রেমের শেষ হয় তখন প্রবঞ্চনা করি অন্যকে। আমি জবাব দিই।

আচার্য হেসে জবাব দেন, 'দুঃখের ব্যাপার কী জানেন, 'পুরুষেরা বিয়ে করে তাদের ক্লান্তি মেটাবার জন্যে। মেয়েরা বিয়ে করে তাদের কৌতূহল মেটাবার জন্যে। কিন্তু সুখী আমরা কেউ-ই হতে পারি না।'

* * *

কিছুদিন বাদে আমি কাশ্মীর থেকে গান্ধী-ক্যাম্পে ফিরে এলাম। যুদ্ধের রসদ সরবরাহ করার জন্যে অজয় শ্রীনগরে রয়ে গেলো। জোজিলা উপত্যকার কাছে একটা এয়ার-পোর্ট করা হবে, সেইখানে মাল নিয়ে যেতে হবে তাকে। আচার্যও সেই সঙ্গে রয়ে গেলো।

ছয়

কাশ্মীর সমস্যা ইউনাইটেড নেশনসে পেশ করা হলো সত্য, কিন্তু রাজনৈতিক আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন হলো না। এ সমস্যা ক্রমেই জটীল হয়ে উঠলো। শ্রীনগর আক্রমণের আয়োজনের সংবাদও পাওয়া গেলো। শোনা গেলো এই অভিযানে পাকিস্তানের সেনারাও যোগ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, খবর পাওয়া গেল যে এই অভিযানের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সৈন্য বাহিনীরও কয়েকজন আছেন।

জিন্না একরোখা মানুষ। নিজের জীবনে কারু বাধা বা আপত্তি শোনেন নি। যেদিন তাঁর কাছে খবর পৌঁছল যে ভারতীয় সৈন্য এগিয়ে আসছে কাশ্মীর রক্ষার্থে সেদিন তিনি ক্ষিপ্ত হলেন।

রাজভবনে তলব পড়লো সামরিক বাহিনীর বড়োকর্তাদের।

রাত্রিবেলা এই বৈঠক শুরু হলো। আলোচনা হলো কী করে কাশ্মীর দখল করা যায়।

তারপর জিন্না টেলীফোন করলেন রাওয়ালপিণ্ডিতে জেনারেল গ্রেসীর কাছে।

'গ্রেসী, আমার কাশ্মীর চাই। দু'দিনের মধ্যে পাকিস্তানের পতাকা ওড়াতে হবে শ্রীনগরে'—হুকুম দেন জিন্না।

'অসম্ভব,' জবাব দেয় গ্রেসী। 'ইয়োর এক্সলেন্সী, কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছে। আজ থেকে সে ভারতের অংশ। যদি এখন শ্রীনগর আক্রমণ করা হয়, তবে আমাদের ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। বিপদের ঝুঁকি নিতে আমি রাজী নই। এই আক্রমণ করার প্রারম্ভে আমি চাই জেনারেল অকিনলেকের হুকুম।'

গ্রেসীর কণ্ঠস্বর শুনে জিন্না বেগতিক বুঝলেন। ক্ষণিকের জন্যে শান্ত হলেন। শ্রীনগর দখলের আশা তিনি ত্যাগ করলেন।

জিন্না পাকিস্তানী সৈন্য দিয়ে শ্রীনগর দখল করলেন না সত্য কিন্তু ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে নিরস্ত হলেন না। এই কাজে সাহায্য পেলেন বহু বিদেশী কাগজ ও বেতার প্রতিষ্ঠানের। এদের পরোক্ষ সাহায্যে জিন্না উৎসাহিত হলেন।

বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে জিন্না আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর তারিফ করলেন। এ ছাড়া পাকিস্তানের হাঙ্গামার জন্যে দোষী করলেন নেহেরু সরকারকে। পাকিস্তানের অধিবাসীদের সতর্ক করলেন। তিনি বললেন যে তাদের লক্ষ্য হবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বললেন, যারা মুস্লীম লীগের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করবে তাদের স্থান পাকিস্থানে হবে না।

এর কিছুদিন বাদে রাওয়ালপিণ্ডি সফরে বেরুলেন লিয়াকৎ আলী। আজাদ কাশ্মীর ফৌজকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বক্তৃতা দিলেন।

শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য মুস্লাম জাতির কাছে চাইলেন সাহায্য।

গান্ধীজি লিয়াকতের বক্তৃতার প্রতিবাদ করলেন। লিয়াকতের অভিযোগ শুনে তিনি অবাক হ'লেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বললেন, যদি কাশ্মীর রক্ষার্থে ভারতীয় সৈন্যর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় তবু তিনি দুঃখিত হবেন না। হরিজন পত্রিকায় লিখলেন, যদি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে কোন সংগ্রাম হয়—যদিও এই সংগ্রামকে তিনি সুদূরপরাহত এবং আকাশকুসুম বলেই মনে করেন—তা হলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতীয় মুসলমান বা নাগরিকগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না। আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য আজাদ কাশ্মীর বাহিনীতে যোগ দিয়েছে শুনে তিনি দুঃখিত হলেন।

* * *

দিনের পর দিন গান্ধীজির কাছে কাশ্মীর আক্রমণের বিবরণী এসে পৌছতে লাগলো। প্রথমে খবর দিলেন মেহেরচাঁদ মহাজন, কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ছাড়া পাবার আগে তিনি কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তান সরকার তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, কাশ্মীরের নিরাপত্তা পাকিস্তান রক্ষা করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা রাখেননি। আফ্রিদিরা কাশ্মীরের বিভিন্ন দিক থেকে এই অভিযান চালিয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ করলেন যে, কাশ্মীরের প্রতি মুসলীম লীগের লোভ অনেক দিনের। প্রায় ১৯৪৫-১৯৪৬এ, লীগ প্রথম শ্রীনগরে তাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করবার চেষ্টা করে। কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীনগরে লীগ-নেতাদের বাড়ীর নক্সা পর্যন্ত তৈরী হয়েছিল।

কিছু দিন বাদে দিল্লীতে খবর এলো যে, আজাদ কাশ্মীর ফৌজের এই অভিযান পরিচালনা করছেন পাকিস্থানের মেজর জেনারেল কিয়ানী। রাওয়ালপিণ্ডিকে করা হয়েছে প্রধান ঘাঁটী। প্রথম দিন আক্রমণের নেতৃত্ব করেন কাউলী খাঁন। এক কালে কাউলী খাঁন ছিলেন ব্রিটিশের গুপ্তচর কিন্তু স্বাধীনতা পাবার পর হলেন একজন উঁচুদরের দেশসেবক। বহু আগেই খাঁনসাহেব তাঁর এক সভায় এই অভিযানের সংকল্প সবাইকে জানিয়েছিলেন। এক দিন ঈদের এক সভায় তাঁর এই আকাঙ্খাকে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়েছিলেন।

পাকিস্তান কী করে এই অভিযানের আয়োজন করেছিল, তার একটা বিবরণী কিছু দিন বাদে এক বন্দীর কাছ থেকে পাওয়া গেলো। নাম তার আবদুল হক, নিবাস পশ্চিম-পাঞ্জাবে। এই সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য লীগ তাকে এক দিন দলভুক্ত করে। তার কথায় জানা গেলো যে, এই আক্রমণ বহু পুরানো সংকল্প। এর জন্যে সমস্ত রসদ জুগিয়েছে পাকিস্তান, আফ্রিদিদের যুদ্ধেও তারা রপ্ত করে দিয়েছে দৈনন্দিন কুচকাওয়াজ করিয়ে। খাওয়া-দাওয়া হতো বিনে পয়সায়। তারপর একদিন পিণ্ডির কোহোলার ক্যাম্পে তাদের সবাইকে জড়ো করা হয়েছিল। সবাইকে প্রায় ছিয়ানব্বুই রাউণ্ড করে গুলী দেওয়া হলো। উরীর কাছে এসে হকসাহেব দেখতে পেলো তার অন্যান্য সঙ্গীদের। কিছুদিন বাদে সবাই মিলে দখল করলে বারামুলা। এরপরে হকসাহেব ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা যখন ফিরে যেতে চাইলো তখন তাদের বলা হলো যে, সে রাত্রেই শ্রীনগর আক্রমণ ও দখল করা হবে। কিন্তু মানুষের আশা বিধাতা কোন দিনই পূরণ করেন না। শ্রীনগর আক্রমণ করার অভিসংকল্প তাই কোন দিনই বাস্তবে পরিণত

হলো না। ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে শ্রীনগরের ভলাণ্টিয়ার বাহিনী রাজধানীকে রক্ষা করলেন।

* * *

হঠাৎ এক দিন কাশ্মীর থেকে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ এলো। শোনা গেলো যে জিন্নার প্রাইভেট সেক্রেটারী খুরসীদ আহমেদকে শ্রীনগরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে ম্যাপ আর বহু জরুরী কাগজপত্র। কাশ্মীরে খুরসীদের আগমন হয়েছিলো এই লড়াই বাধবার আগে। একদিন তাঁকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলো জুম্মা মসজিদের কাছে। কিন্তু তাঁর ছদ্মবেশ 'বাঁচাও ফৌজের' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারলো না। খুরসীদ গ্রেপ্তার হলেন।

এই সংবাদে দিল্লীর সরকারী মহলেও রীতিমতো চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হলো। স্পষ্ট বোঝা গেলো যে এই অভিযান পাকিস্তানের গড়া। ইতিমধ্যে জিন্না রেডিও পাকিস্তানের এক বক্তৃতায় বললেন—"Our deeds are proving to the world that we are in the right and I can assure you the sympathy of the world, particularly that the Islamic Countries are with you."

সাত

চব্বিশে ডিসেম্বর। ডুন ক্যাম্পবেল, রয়টারের সংবাদদাতা, আমাদের কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করলেন তাঁর হোটেলে। ডুন পাকা রিপোর্টার। একটা হাত হারিয়েছেন বার্লিনের এয়ার রেডে। যুদ্ধের শেষভাগটা কাটিয়েছেন বর্মায়, ইন্দোচীনে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার আগে ডুন এদেশে ফিরে এলেন।

একদিন জিন্নাসাহেব তলব করলেন ডুনকে। মৎলব ছিল পাকিস্তানের করিডোর-দাবীর সংবাদ কাগজে প্রকাশ করার।

জিন্নাসাহেব ডুনকে যখন ডেকে পাঠালেন তখনও ডুন এদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'ননি। কাজেই করিডোরের সংবাদ যেদিন কাগজে প্রকাশিত হলো সেদিন কংগ্রেস মহলে সাড়া পড়ে গেলো। কংগ্রেস নেতারা একটু বিচলিত হলেন। কেউ-কেউ সন্দেহ করলেন রয়টারকে। বলা হলো রয়টার বিদেশী, তাই ইচ্ছে করে এ কারসাজী করছে। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে দু-একজন ডুনকে সন্দেহ করলেন।

হোটেল সিসিলে ডুন থাকে। সন্ধ্যার একটু পরে উপস্থিত হওয়া গেল। বন্ধুবান্ধবেরা আগেই আসর জমিয়ে বসেছিলেন।

গল্প যখন বেশ জমে-উঠেছে তখন দূর থেকে এক ভদ্রমহিলা আমাদের টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশের উপর কিন্তু সে-বয়সের ছাপকে ঢেকে রাখা হয়েছে সাজ-সজ্জায়। উঠে দাঁড়ালেন মাধবদা। বললেন, 'মিসেস বোস দেখছি যে। আপনি যে দিল্লীতে আছেন এ তো আমার জানা ছিল না।'

জবাব দেন মিসেস বোস, সঙ্গে থাকে হাল্কা হাসি। বলেন, 'কী করবো ভাই, না এসে পারলুম কৈ? উনি তো সিলেকসন গ্রেডে প্রমোশান পেয়েছেন, তাই ডাক পড়েছে দিল্লীতে। যাক্, তোমার কথাই আজ মনে পড়ছিলো। হঠাৎ দূর থেকে দেখতে পেয়ে নিজেই চলে এলুম।'

মাধবদা আলাপ করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে মিসেস বোসের। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী। মাধবদার সঙ্গে তাঁর পরিচয়

বহুদিনের। বহু নারী-সেবা-সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। আলাপ পরিচয় সেই সূত্রেই।

মিসেস বোসের দল একটু দূরেই বসেছিলেন। তিনি আমাদের অনুরোধ জানালেন সেই পার্টিতে যোগ দেবার জন্যে। বিশেষ করে মাধবদা ও আমাকে।

আমরা দুজনে উঠে গেলুম। ওঁরা দলে ছিলেন জন সাতেক। অধিকাংশই মধ্যমবর্ষীয়া। এর মধ্যে প্রৌঢ়স্থানীয়া ছিলেন একজন। পরিচয়ে প্রকাশ পেলো এঁরা দিল্লীর 'এলিট' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

আজকের এই পার্টির আয়োজন পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু নারীদের জন্যে। যে জনসমুদ্র পানিপথ ও কুরুক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছে তাদের জন্যে চাই সাহায্য। তাই অসংখ্য নারীর সেবার জন্যে ওঁরা অগ্রসর হয়েছেন।

প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা মাসীমা বলে পরিচিতা, পরিচয় করিয়ে দিয়ে মিসেস্ বোস বলেন, 'মাসীমা, এরা খবরের কাগজের লোক। আমার বিশেষ বন্ধু। আমাদের কাজে এদের সাহায্যের দরকার হবে।'

মাসীমা জবাব দেন, ঠিক বলেছো, 'আমাদের সেবা-সঙ্ঘের বয়স অল্প। একে জিইয়ে রাখতে হলে আমাদের হামেশাই দরকার হবে পাব্লিসিটির।'

'আজকের মিটিংএর রিপোর্টে আমাদের সবার নাম দিয়ে দেবেন তো? টেবিলের একপ্রান্ত থেকে আর এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন। নাম তাঁর মিসেস জানা।'

ধমক দেন মাসীমা, 'কি বাজে বকছো বাসন্তী। কাগজে শুধু মাত্র নাম বের করলেই আমাদের হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য মহান। কাগজের মারফৎ আমরা শুধু মাত্র বলতে চাই দুঃস্থা নারীদের

যে তাদের সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা বলতে চাই দেশবাসীকে যে তারা দলে-দলে এগিয়ে এসে আমাদের একাজে সাহায্য করুক। তা তোমরা কী খাবে ভাই? হুইস্কী না জিন?'

শেষের কথাগুলো আমাদের উদ্দেশ করে বলা।

সেদিন ছিল ক্রীসমাস। তাই এই পুণ্য দিনে মাসীমার দল এই মহান কাজে ব্রতী হয়েছেন। পার্টির নাম না করলে কর্মীদের একসঙ্গে যোগাড় করা যায় না। তাই আয়োজন হয়েছে এই ছোটখাটো জলসার।

ব্যোয়কে ডাকলেন মিসেস বোস। তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু থেকে নীচে নেমে এলো। হুকুম হলো পানীয়ের।

এদিকে অনর্গল কথা বলতে লাগলেন মাসীমা।—'জানো ভাই এতো বড়ো কাজের দায়িত্ব নিয়েছি, তাই অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। রিলিফের কাজে আমি হাত পাকিয়েছি যথেষ্ট। আমরা যখন বর্ধমানে পোস্টেড তখন দামোদরে বন্যা এলো, সমস্ত রিলিফ কাজের দায়িত্ব এলো আমার উপর।'

জানা গিন্নী কথায় বাধা দেন। বলেন, 'মাসীমা, রাত হয়ে যাচ্ছে, মিটিং শুরু করে দেয়া যাক।'

আরম্ভ কী করে করি। সবি যে এখনও এলো না। বার-বার আমায় বলে দিয়েছে, মাসীমা, আমি না আসতে সভার কাজ শুরু করো না। রিলিফের কাজে ওর কতো ইণ্টারেস্ট জানোত।'

আধঘণ্টা বাদে শ্রীমতি সবি এলেন। দেখে মনে হলো ইনি আমার পরিচিতা। বহুদিন আগে একবার কলকাতায় আলাপ হয়েছিল। সবেমাত্র নোয়াখালীর দাঙ্গা শেষ হয়েছে। সম্পাদকের

আদেশে গিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। স্যোশাল ওয়ার্কার বলে জনসমাজে বিশেষ পরিচিতা। কাজেই বাড়ী খুঁজে নিতে কষ্ট হলো না। ড্রেসিংগাউন পরে তিনি এলেন দেখা করতে। ঠোঁট তাঁর রঙীন, গালের উপর দেয়া বহু পাউডারের প্রলেপ।

সবি দেবী আমায় সিগারেট অফার করলেন। ধূমপানের অভ্যাস ছিল কিন্তু তার পরিবেশন কখনই নারী হস্তে হয়নি, তাই একটু দ্বিধা বোধ করলাম।

সবি দেবী হেসে বললেন, 'তা হলে ড্রিংকসের বন্দোবস্ত করি?'

আপত্তি করলাম না। তৃষ্ণার্ত হয়েছিলাম। তাই ভাবলাম লিমন্ স্কোয়াস দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু এলো জিনের বোতল। সঙ্গে লাইম ও সোডা। একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম, তাই সবি দেবীকে জানালাম অসুবিধার কথা।

'ওঃ, আপনি দেখছি বড্ডো ছেলেমানুষ। কি রকম প্রেস রিপোর্টার আপনি, ড্রিংকস্ করেন না,' একটু ভৎসনার সুরেই সবি দেবী বলেন।

এর পরে কাজ শুরু হলো। সবি দেবী বলে গেলেন নোয়াখালীর দুঃস্থাদের জন্য দেশবাসীর কী কর্তব্য। তাদের মান-ইজ্জত রক্ষা করাই আজকে সবচাইতে বড় কর্তব্য। তাই তিনি দিলেন দেশবাসীর প্রতি এক 'ক্লরিয়ন কল'—এগিয়ে আসুন আপনারা, দেশের মেয়েদের মান রক্ষা করতে। এর পরে ত্রুটি ধরলেন দেশের সরকারের।

বিবৃতি শেষে সবি দেবীকে পড়ে শোনানো হলো।

'ওঃ অনেক সিডিসাস্ কথা বলে ফেলেছি। আচ্ছা, একবার শিবপদকে পড়ে শোনালে হয় না?'

বলা বাহুল্য শিবপদ সবি দেবীর স্বামী। গভর্নরের বাড়ীতে একটা পার্টি ছিল, তারই জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বিবৃতি পড়ে দেখলেন। কাটছাঁট হলো একটু।

বেরিয়ে আসার সময় সবি দেবী প্রশ্ন করলেন, 'আমার বিবৃতিটা কী আপনারা আজই সার্কুলেট করছেন?'

আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়, আজই যাবে।'

'নাঃ, সে জন্যে বলছি নে। তবে কী জানেন, আমি এখনও নোয়াখালী যাইনি। কাল ভোরে চাঁটগা মেলে যাবার কথা আছে। আমার মনে হয় আমি পরশু দিন নোয়াখালী পৌছলে পর এটা যদি 'সার্কুলেট' করেন তবে বড্ডো 'এফেক্টিভ' হয়, তাই নয় কি?'

* * *

সবি দেবী সেদিনও আমায় চিন্‌তে পারলেন। আমাদের বললেন, 'মাসীমা কি গোছানো লোক। প্রেসদেরও ভোলেন নি। তা বাপু দেখবেন রিপোর্ট যেন ঠিক মতো বেরোয়। কই, ফটোগ্রাফার কাউকে আনেননি তো?'

সভার কাজ আরম্ভ হলো। বক্তৃতা করলেন মাসীমা ও সবি দেবী। বুঝিয়ে দিলেন এই সঙ্কটে তাঁদের কী কর্তব্য। 'ইংরেজ এই দেশের সর্বনাশ করে দিয়েছে, এনে দিয়েছে দুঃখ। আজ দেশ হয়েছে স্বাধীন, তাই তাঁদের কর্তব্য দেশের সেবা করা'।

বলতে-বলতে সবি দেবীর গলা ধরা এলো। রুমাল বের করে নিয়ে মিসেস জানা চোখ মুছে নিলেন। পাশেই দে-গিন্নী বসেছিলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'এই সব শরণার্থীদের দেখলে আমার কান্না পায়। কী করে যে এরা দিন কাটায় আমি কল্পনাই করতে পারি না।'

একটা ছোট সাব কমিটি তৈরী হলো। ঠিক হলো এরা রিলিফের কাজ করবেন।

সভা শেষে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন আমার এক সহকর্ম্মী। রাস্তায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বললে তোমার বৃদ্ধারা?'

'দুঃস্থা নারীদের উদ্ধার করবে বলছে।'

'কিন্তু ওদের উদ্ধার করবে কে? প্রেসওয়ালারা বুঝি?' তিনি হেসে প্রশ্ন করেন।

* * *

বাড়ীতে এসে দেখি আচার্য বসে আছে। চুল তার এলো-মেলো, চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল। ঘরে ঢোকামাত্র বললেন, 'বড়ো দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আপনার জন্যে। অজয় ইজ্ ডেড।'

কথাটা আমার প্রতি শিরা-উপশিরায় ঝলক মেরে দিয়ে গেলো। বিশ্বাস করতে পারলাম না। প্রথম মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখ্ছি।

আচার্য বল্তে লাগলো, 'আমরা দুজনে গিয়েছিলাম বেড়াতে বারামুলায়। জায়গাটা ফরোয়ার্ড এরিয়া, সবে মাত্র শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার হয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে দুজনে চলে গিয়েছিলুম শত্রুর আঁওতার মধ্যে। জীপ থেকে নেমে একবার হাঁটতে লাগলাম, অজয় জীপে বসে রইলো। অনেকটা দূর এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ অজয়ের চীৎকার শুনতে পেলাম। দুজ'ন আফ্রিদি আমার দিকে ছুটে আস্ছে। বাঁচবার কোন আশাই ছিল না আমার, কিন্তু রক্ষা করলে অজয়। টপ্ স্পীডে গাড়ী চালিয়ে দিল আফ্রিদিদের লক্ষ্য করে। ও ব্যাটা দুটো মরলো বটে কিন্তু ব্যালান্স হারিয়ে ফেললো অজয়। গাড়ী উল্টে গেলো আর সেই সঙ্গে ও ছিট্‌কে পড়লো।

আমার চীৎকার হল্লা শুনে আমাদের ফৌজের কয়েকজন এগিয়ে এলো। অচৈতন্য অবস্থায় ওকে নিয়ে গেলাম বারামুলার হাসপাতালে। দুর্ঘটনা হবার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অজয় বেঁচেছিল। মরবার আগে আমার হাত ধরে বললো, আচার্য, যদি কখনো অলোকার সঙ্গে দেখা হয়, বলবেন যে ওকে আমি মরবার দিন পর্যন্ত ভালোবেসেছি।'

তারপর নিজের ঘড়ির ব্যাগের ভেতর থেকে বের করে দিল অলোকার একটা ছোট ছবি। বললে, এটা রেখে দিন আচার্য সাহেব, কখনো যদি ওর দেখা পান তবে 'এটা ওকে দিয়ে দেবেন।'

বলতে বলতে আচার্যর চোখে জল এলো। বললে, 'ভাবতে পারি না অজয় কেন আমার জন্যে প্রাণ দিল। আত্মহত্যা ছাড়া এ কিছুই নয়। নিজের জীবনের কখনো পরোয়া করিনি, কখনো ভাবিনি যে বেঁচে থাকার কোন অর্থ আছে। কিন্তু আজ শিখেছি অজয়ের কাছ থেকে, জীবনকে ভোগ করাই শুধু মাত্র আমাদের কামনা নয়, নিজেকে পরের মাঝে বিলিয়ে দেয়া এর চাইতে মহান।

* * *

এর কিছুদিন পর মাসীমা খবর পাঠালেন। সেদিন ছিল মাসীমার রিলিফ কমিটির মিটিং। কাজেই ফলাহারের আয়োজন বেশ জমকালোই হয়েছিল।

আলোচনা চলছিল পানিপথের রিলিফ কমিটির কাজ সম্বন্ধে। ঠিক হয়েছে ছোট একটা দল যাবে রিলিফের কাজে। অনেকেই উৎসাহিত হলেন, বিশেষ করে দে-গিন্নী। বললেন, 'দিল্লীতে একটানা থাক্‌তে-থাক্‌তে একটা ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। যাক্, তবু কিছুদিনের জন্যে চেঞ্জে যাওয়া যাবে।'

প্রস্তাব করলেন মিসেস্ জানার মেয়ে, 'আচ্ছা, মাসীমা, মোটরে গেলে হয় না ? আমার বাপু ট্রেনে যেতে ভালো লাগে না, কি বিশ্রী জার্নি।'

মিস্ জানার প্রস্তাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন উপস্থিত তরুণদল। মিস্ জানা সগ্য মোটর ড্রাইভিং শিখেছেন, কাজেই তাঁরা বিপদের আশংকা করেন। অবশ্য আপত্তি এলো মাসীমার কাছ থেকেই।

'বাজে বকোনা ডলি, এইসব গরীবদের মাঝে মোটর হাঁকিয়ে গেলে ওরা ভাববে কি বলোতো'।

সায় দেন মিঃ দত্ত। তিনি সগ্য বিলেত-প্রত্যাগত, লণ্ডন স্কুল অব ইক্নমিক্সের ছাত্র। গরীব ও ধনীর মাঝে বর্ডার লাইনটা কোনটা তা তিনি চোখ-বুঁজে বলে দিতে পারেন। ডলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবশ্য তাঁর চিন্তা করার কারণ আছে। কারণটা অবশ্য অহেতুক নয়। তিনি চাইছেন যে তাদের দুজনের ভবিষ্যৎ এক হয়ে যাওয়া দরকার। তাই একটু ভৎর্সনার স্বুরেই বলেন, 'সত্যি ডলি, তুমি নিশ্চয় পানিপথে যাচ্ছো না। আই কান্‌ট্ ড্রীম অব্ ইট'।

দুজনের ধমক খেয়ে ডলি জানা একটু নিরাশ হ'ন। তবু বলেন, 'কলেজের ম্যাগাজিনে যে আমার এইসব উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে একটা 'আর্টিকেল' লিখতে হবে। নিজের চোখে না দেখলে লিখবো কি করে !'

অনেকক্ষণ ধরে ডলি জানার সঙ্গে কথা বলার প্রতীক্ষায় ছিলেন অমল রায়।

তাঁর গায়ে আছে পিট্সবার্গ ইউনিভার্সিটির ছাপ। 'আপনি যাবেন মিস্ জানা ? দেন, আই শুড অলসো গো, ক্যামেরাটা নিয়ে যাবো, ছবি তোলা যাবে।'—অমল রায় বলেন।

এবার মাসীমা রেগে যান। বলেন, 'তোমরা কেন হট্টগোল করছো। এম্‌নি করে কোন রিলিফের কাজ হয় না।'

ঠিক হলো পরের দিন এরা কয়েকজনা মিলে যাবেন পানিপথে।

* * *

একদিন মিসেস বোস হঠাৎ টেলিফোন করলেন। তার ছেলে মাণিকের জন্মদিন, সেই উদ্দেশে এক চা-পার্টির আয়োজন হয়েছে। আমরা যেন উপস্থিত থাকি।

সন্ধ্যার কিছু আগে পৌঁছানো গেলো মিসেস বোসের বাড়ীতে। বিরাট লন, সেখানে অতিথিরা ঘোরাফেরা করছেন।

দ্বারপ্রান্তে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন স্বয়ং মিসেস বোস।

'কী হলো আপনাদের পানিপথের রিলিফ কমিটির, খুব কাজ করেছেন বুঝি?' আমিই জিজ্ঞেস করি।

'সে অনেক কথা, পরে বলবখন। দেখবেন, না বলে পালিয়ে যাবেন না,' মিসেস বোস এই বলে অন্যদিকে চলে গেলেন।

সবি দেবীও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন এক সমবয়স্ক তরুণ ভদ্রলোকের সঙ্গে। বললেন, আপনাদের সমগোষ্ঠীই বলতে পারেন, আর্টিস্ট ও কবি।

ভদ্রলোকের নাম প্রবীর গুহ। ক'লকাতার বাসিন্দা, হালে দিল্লীতে এসেছেন। তাঁর চারদিক ঘিরে মেয়েরা রচনা করেছে এক ব্যূহ।

আলাপ হচ্ছিলো সাহিত্য ও আর্ট নিয়ে। 'আর্ট ফর আর্টস সেকের' সমর্থনকারীরা জোর গলায় তাঁদের মতবাদ প্রচার করছিলেন।

হঠাৎ প্রবীর গুহকে প্রশ্ন করলেন রত্না রায়, 'সত্যি মিঃ গুহ বাংলা সাহিত্যের কী দুর্দিন দেখতে পাচ্ছেন। বাংলা বইতো আমি প্রায় পড়তেই পারি না।'

'আমরা আধুনিক সাহিত্যিক, ভালো উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা বই লিখিনে। আমরা বলতে চাই দুটো ভাল কথা পাঠকদের ভালো করার জন্যে, এটাই হচ্ছে আমাদের লেখার গলদ', গুহ জবাব দেন।

অনিতা গুপ্তা সাহিত্যের ক্রিটিক, কারণ হালে তাঁর দু-একটা প্রবন্ধ 'স্টেটসম্যানে' বেরিয়েছে। কাজেই অথরিটি নিয়ে কথা বলার অধিকার তাঁর আছে। তিনি বলেন, 'কিন্তু জানেন কী মজার ব্যাপার। আমার কিন্তু সবচাইতে ভালো লাগে বইয়ের শেষের চারপাতা। ওটাই আমি প্রথমে পড়ি। তারপর যখন কাহিনীর মধ্যিখানে পৌঁছুই, তখন বড্‌ডো ঘুম পায়। কেন হয় বলুন তো?

'আধুনিক বাংলা সাহিত্য হচ্ছে 'ইন্টেলেকচুয়াল' আনএমপ্লয়েডদের একমাত্র বিলাস। আমরা সাহিত্যিক, আমাদের বিপদ অনেক। ব্যাপার কী জানেন, আমরা যদি সোসাইটিতে না মিশি তা হলে কেউ আমাদের বই পড়ে না,' গুহ বলেন।

'আর যদি মেশেন?'

'তা হলে তো লিখতেই সময় পাইনে।'

তুমুল হাস্যরোল উঠলো।

'সত্যি মিঃ গুহ, আপনি ব্রুটালি সত্যি কথা বলেন। কিন্তু সত্যি কথা বলার অনেক বিপদ। লোকের কাছে আমরা বড়ো খেলো হয়ে পড়ি। আমরা কী ধরনের লোক তখন্ সবাই জানতে পারে,' রত্না রায় মন্তব্য করেন।

'কিন্তু মিস্ রায়, দুজন মানুষ যখন একই কথায় বিশ্বাস করেন তখন তো আর সেটা সত্যি কথা হয় না, দ্যাট সিস্‌েস টু বী ট্রু।'

উত্তর আমি দিই, 'এটা হচ্ছে আপনার মেটাফিসিকাল বিশ্লেষণ। আপনি কী বলতে চান যে একই সত্যি কথা দু'জনার মন উপলব্ধি করতে পারে না?'

'ঠিক বলেছেন। সত্যি কথা বার-বার বলার কোন প্রয়োজনই নেই। আমাদের কাছে দুটো জগৎ, একটা বাস্তব, যা নিয়ে আমরা কখনো তর্ক করিনে, করার প্রয়োজন হয় না কারণ ওটাতো আমাদের চোখের সামনেই ভাসছে। আর একটা আর্টের জগৎ। ওটা নিয়ে আমরা সদা-সর্বদাই বাদানুবাদ করতে চাই, কারণ নইলে ভয় আছে ভেঙে যাবার।'

'আপনার কথা কিন্তু আমি সিরিয়াস্‌লি নিতে পারছিনে প্রবীরবাবু,' একজন বলেন।

'পারবেনও না, কারণ এযুগের রীতি হচ্ছে বোকাদের সিরিয়াসলি নেয়া।'

ডলি জানা বহুক্ষণ ধরে চুপ করে এক কোণে দাঁড়িয়েছিলেন। আলোচনায় যোগ দেননি। হঠাৎ প্রশ্ন করেন।

'দেখতে পাচ্ছি লোক কনভর্ট করার ক্ষমতা আপনার অপরিসীম। অথচ আপনি উপন্যাস লেখেন না, কী আশ্চর্য!'

'পাগল হয়েছেন, কাউকে কখনো কনভর্ট নিজের মতধারায় করতে নেই। ওতে বিপদ আছে। সেই রাজার মেয়ে ও ঋষির গল্প শোনেন নি?'

চারদিক থেকে গুঞ্জন ধ্বনি উঠলো, 'বলুন না, বলুন না।'

বলতে থাকেন গুহ, 'এ কাহিনী আমার রচনা নয়, পরের থেকে ধার করা।'

হ্যাঁ, তবে শুনুন, অনেক বছর আগে এক রাজার পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল। দিনরাত সবাই এসে রাজার মেয়ের গুণ গাইতো।

একদিন রাজার মেয়ে শুনতে পেলেন সেই রাজ্যের একপ্রান্তে আছেন এক তরুণ ঋষি। সর্বক্ষণই মগ্ন আছেন ভগবানের আরাধনা নিয়ে। কেউ তার সে ধ্যান ভাঙ্গতে পারে নি। শুনে রাজার মেয়ের রাগ হলো। প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ঋষির মনকে তিনি ভোলাবেনই। রাজার মেয়ে গেলেন তরুণ ঋষির সঙ্গে দেখা করতে।

শহর ছেড়ে রাজকন্যা এলেন ঋষির আশ্রমে। কুটীরের প্রান্তে ফলমূল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিন্তু ঋষি ধ্যানে মগ্ন। রাজকন্যার ডাক তার কানে পৌঁছলো না।

এমনিভাবে দিন কয়েক কেটে গেল, কিন্তু ঋষি রাজকন্যার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন না।

বহু সাধ্য সাধনার পর একদিন ঋষি তাকালেন। রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন : কী প্রয়োজন ?

জবাব দিলে রাজকন্যা : আমি এই দেশেরই রাজার মেয়ে। আপনি কেন এই দুর্গম জায়গায় বসে তপস্যা করছেন ? আপনি চলুন আমার সঙ্গে রাজধানীতে, ধন-দৌলত দেবো প্রচুর আর সেই সঙ্গে বানাবো আপনাকে রাজ-জামাতা।

ঋষি হাসতে থাকেন, বলেন : আমার কাছে ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ রাজা ন'ন। ভগবানের ভালবাসা ছাড়া আমি আর এ জগতে কিছুই প্রত্যাশা করিনে।

এরপরে তরুণ ঋষি রাজকন্যাকে শোনালেন ভগবানের কথা। তাঁর অমৃত বাণী। বলতে বলতে তার গলার সুর নরম হয়ে এলো, চোখে-মুখে উঠলো এক দীপ্তি।

ঋষি রাজকন্যাকে বোঝালেন পাপ-পুণ্যের কী তফাৎ। কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কী করে পাওয়া যায় তারই সন্ধান।

রাজকন্যা শোনালেন ঋষিকে তার দেশের কাহিনী! কি করে রাজা চালাচ্ছেন দেশ। কত তরুণ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে রাজকন্যাকে পাবার আশায়। তার মণি-মুক্তার ধন-দৌলতের গল্প। রাজকন্যা বললেন, জীবনে পেয়েছি অনেক কিন্তু আজ মনে হচ্ছে কিছুই পাইনি, শান্তির স্বাদ থেকে যেন রয়েছি বঞ্চিত। কিন্তু আপনি আজ সেই শান্তির সন্ধান আমায় দিয়েছেন।

তাই আমি ঠিক করলাম আমার সে ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দেবো, বরণ করে নেবো তপস্বিনীর জীবন।

রাজকন্যা ঋষিকে প্রণাম করলেন।

রাজকন্যার কথা শুনে ঋষি অবাক হলেন।

এ কণ্ঠস্বর তাঁর কাছে শোনালো বীণার ঝংকারের মতো। তিনি লালায়িত হলেন রাজকন্যার ঐশ্বর্যের জন্যে। কখনও জীবনে আনন্দ করেন নি কিন্তু আজ তাঁর আকাঙ্খা হলো প্রবল জীবনের সেই স্বাদ গ্রহণ করবার। রাজকন্যার স্পর্শ পেয়ে তিনি শহরে আসবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রাজকন্যাকে বললেন, চলো আমরা দুজনে যাই শহরে। সেখানে ভোগ করবো জীবনের অমৃত-সুধা।

দৃঢ়কণ্ঠে রাজকন্যা এ প্রস্তাব অস্বীকার করলেন। বললেন, প্রভু আপনি আমায় দেখিয়েছেন চিরশান্তির পথ। আমি জানি যে আমি পাপী, তাই এখানে বসে আরাধনা করে সে পাপ থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমি আর শহরে ফিরে যাবো না। আপনি একাই যান।

বেশ তাই হোক। তরুণ ঋষি রাজকন্যাকে শুভেচ্ছা কামনা করে একাই শহরে চলে এলেন।

রাজকন্যা এসেছিলেন ঋষিকে পটাতে। কিন্তু পারলেন না, নিজেই পটে গেলেন। জীবনের শেষের কটা দিন সেই আশ্রমে কাটালেন ভগবানের আরাধনা করে।

তরুণ ঋষির মন থেকে মুছে গেলো ভগবানের ছবি। শহরে তিনি এলেন নিজের জীবনকে আনন্দ স্রোতে ভাসিয়ে দিতে।

সারা জীবন মত্ত রইলেন আমোদ-প্রমোদে।

গল্প বলতে বলতে গুহ একটু থেমে যান। তারপর একটু দম নিয়ে বলেন : কাহিনীর শেষ আরো দুঃখের।

সমবেত কণ্ঠস্বরে আবেদন এলো : বাঃ রে শেষটা আপনাকে বলতেই হবে। কী হলো বলুন ?

: কী আর হবে। রাজকন্যা অনাহারে তপস্বিনী হয়ে সেই আশ্রমে মারা গেলেন। আর তরুণ ঋষি উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবন যাপন করে মাতাল হয়ে রাজপথে একদিন জীবনলীলা সাঙ্গ করলেন। লোক 'কনভর্ট' করার কী বিষম পরিণাম দেখতে পেলেন তো ?

কাহিনী শুনে সবাই প্রশংসা করতে লাগলেন গুহের। অনুরোধ এলো আরো গল্প বলার। অনিতা গুপ্ত বললেন : মার্ভেলাস ! আচ্ছা, শুনছি আপনি নাকি একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। কী ছবি আঁকেন বলুন না ?

মানুষের ছবি এঁকেই তো সব চাইতে আনন্দ, জবাব দেন গুহ।

পলিটিসিয়ানদের ছবি 'পেন্ট' করেন নিশ্চয় ? জিজ্ঞেস করেন বাগচী। বাগচী ব্যারিস্টার, হালে রাজনীতি ক্ষেত্রে নেমেছেন। পার্লামেন্টে যাবার ইচ্ছে আছে।

পাগল হয়েছেন! পলিটিসিয়ানদের কী 'পেণ্ট' করা যায় বলেন তো তাদের ছু একবার 'হোয়াইটওয়াশ' করে দিতে পারি।

আবার হাসির রোল উঠলো।

কিছুক্ষণ বাদে মিসেস বোস আমায় একপ্রান্তে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন তাঁদের পানিপথে যাবার বিভ্রাটের কাহিনী।

নির্দ্ধারিত দিনে সকালেই মাসীমা সদলবলে স্টেশনে হাজির হয়েছিলেন। বাড়ি থেকে রওনা হতে দেরী হয়েছিল। উদ্বাস্তুদের জন্যে নিতে হবে খাবার ও মিল্ক পাউডার। খাবারটা কী হবে সেই নিয়ে তর্ক উঠেছিল। মিসেস বোস প্রস্তাব করেছিলেন নেহাৎ মামুলী ধরণের মেনু। কিন্তু এতে মাসীমা রাজী হলেন না। কেক বিস্কুটের টিন নেওয়া হলো অপর্যাপ্ত। চা-কফিও এতে আছে আর আছে ছেলেদের জন্যে টফি ও চকোলেট। শেষ পর্যন্ত এর সঙ্গে নেওয়া হলো স্যাণ্ডউইচ। চিকেন ও হ্যাম।

গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে, মাসীমার দল তাড়াহুড়া করে যে কম্পার্টমেণ্ট প্রথমে পেলেন তাতেই চড়ে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিলে।

আধ ঘণ্টা গাড়ি চলার পর অমল রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন, মাসীমা, এটা পানিপথের গাড়ি নয়। আমরা নিশ্চয় আগ্রার গাড়িতে চড়ে বসেছি। ঐ দেখুন ফরিদাবাদের কলোনী।

একটা করুণ আর্তনাদ উঠলো গাড়ির মধ্যে। চারদিক থেকে উঠলো কলরব। 'ওমা তাই তো কী হবে! শেকল টান, গাড়ি থামাও।'

বিপদের মাঝেও মাসীমা শান্ত থাকেন। তিনি বলেন, গাড়ি থামিয়ে কি লাভ হবে? পানিপথে আর আমাদের যাওয়া হবে না। আমরা ভুল ট্রেনে উঠেছি। পানিপথের আর আগ্রার গাড়ি বোধ হয় একই প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে ছিলো। দত্ত তোমায় না বলেছিলুম টিকিট-চেকারের কাছে খোঁজ নিতে? তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই।

ডলি জানা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দত্ত'র নির্বুদ্ধিতা দেখে, বলেন, সত্যি দত্ত, হাউ কুড ইউ ডু ইট!

অমল রায় এই ভৎর্সনায় একটু খুশি হলেন। বল্লেন, ভাগ্যিস আমি লক্ষ্য করেছিলুম! নইলে কি কাণ্ডই না হয়ে যেতো!

উত্তর দেন মিসেস বোস—কিছুই হতো না—পানিপথে যাবার আমাদের কোন উপায় নেই। এই ট্রেন সোজা একদম থামবে মথুরায়।

বাকি সবাই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলো—

তা হলে কী হবে?

মাসীমা বলেন, থাক, এ যাত্রায় আমাদের পানিপথে যাওয়া স্থগিত রাখতেই হলো। ট্রেনে যখন চড়ে বসেছি তখন চলো যাই আগ্রায়। সঙ্গে খাবার-দাবার প্রচুর আছে, ওখানেই পিকনিকের মতো একটা করা যাবে।

প্রস্তাবটা যুৎসই হলো সবার।

আট

দেশের শাসনতন্ত্রের যখন হলো অদলবদল, তখন দিল্লীর সমাজে এলো এক পরিবর্তন। মনে হলো যেন বহুদিনের ইংরেজ-বিদ্বেষ দূর

হয়ে গেছে। হোটেল, পার্টি ও ক্লাবে তখন উজান এসেছে দেশ-প্রীতির। মেয়েদের ব্লাউজে ও ছেলেদের বুশ শার্টে এর প্রতীক রয়েছে আঁটা—তিরঙ্গা ঝাণ্ডা। মোটরের বনেটে ও দরজায় লেখা আছে 'জয় হিন্দ'। গৃহিণীরা ধরেছেন খদ্দরের শাড়ি, কর্তা খদ্দরের স্যুট, কোটে আঁটা আছে একখানা গান্ধীজির ছোট ছবি।

দিল্লীসমাজের স্তম্ভ। এর পরে এরা শুরু করলেন দেশের রাজনীতি চর্চা। কর্তা কংগ্রেসবাদী, গৃহিণী বামপন্থী সোস্যালিস্ট। কন্যা অবশ্য কম্যুনিস্ট। পুত্র প্রেমিক, প্রেমের সোস্যালিজমে তার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

এদের বৈঠকে মাঝে-মাঝে আমরা হানা দিতাম। অনাহূত হয়ে নয়, সাদরে আমন্ত্রণ পেয়ে।

প্রায়ই মোটর হাঁকিয়ে, ঠোঁট রাঙিয়ে আসতেন সমাজের ভ্রমরার দল এই বৈঠকে।

আসর যখন জমে উঠতো তখন হয় তো আসতো এদের কারু কারু বাড়ি থেকে টেলিফোন। আয়া ডাকছে, ছোট ছেলেটা কাঁদছে। অবশ্য এর প্রেসক্রুপসন দেওয়া হতো টেলিফোনের মারফৎ। সভা যখন ভাঙতো তখন রাত্রি হয়ে যেতো গভীর।

আমরা সাংবাদিক, এই সভায় আমাদের বিশেষ আদর ছিল। কচুরী, সিঙ্গাড়া সমাপ্তির শেষে আসতো মিহি সুরে অনুরোধ। এই 'সিম্পোসিয়ামের' একটা ছোট রিপোর্ট কাগজে বের করে দেওয়ার জন্যে। অবশ্য এতে বক্তাদের চাই নামের প্রাধান্য।

*   *

একদিন এমনি এক সভায় আমন্ত্রণ পেলাম। যেতে হবে কনষ্টিট্যুশন ক্লাবে।

দ্বারপ্রান্তে অভ্যর্থনা করলেন সেন। দিল্লীর অধিবাসী হয়েও তাঁর পদবীর বিকৃতি ঘটেনি কিন্তু ঘটেছে আকৃতির। ঘটবার যথেষ্ট কারণ ছিল। দেশ স্বাধীন হ'বার পর একদিন সুপ্রভাতে সেন জানতে পারলেন যে রাতারাতি তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। খবরটা অপ্রত্যাশিত, শোনালো অনেকটা দুর্ঘটনার মতো। তবু সাহস করে সেন গেলেন তাঁর বড়োকর্তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

কর্তা সহাস্যে সেনের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করলেন। উপদেশ দিয়ে বললেন, মনিবদের সমীহ করে চলো, আর যদি কখনও দেখতে পাও বাজারে দুর্নাম রটেছে তবেই জানতে পারবে যে কাজ ঠিক মত চলছে।

কী রকম? ভয়ে ভয়ে সেন প্রশ্ন করেন।

: তবে একটা গল্প বলি শোন। বাংলা দেশে এককালে এক জাঁদরেল ইংরেজ হাকিম ছিলেন। তাঁর নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। অবশ্য তার দোর্দণ্ড প্রতাপের দরুণ বাঘেরা সে মুলুকের তল্লাটেও ছিল না, কাজেই শুধুমাত্র গরুরাই বিরাজ করতো।

একদিন হাকিম তাঁর ভৃত্যকে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে, এই জেলার লোকেরা আমার সম্বন্ধে কী বলে?

ভৃত্য ভাবলো যে তার মনিবের যা সুখ্যাতি, বর্ণনা করলে তার সামান্য চাকুরীটি খোয়াবার আশু সম্ভাবনা। তাই সে একগাল হেসে বললো : হুজুর, সবাই আপনার সুখ্যাতি করে।

ভৃত্যের জবাব শুনে হাকিম চটে গেলেন। কষে লাগলেন দু'ঘা! বললেন, মিথ্যে বলছিস।

এর কিছুদিন বাদে হাকিমের কাছে ভৃত্যের আবার তলব পড়লো। তিনি প্রশ্ন করলেন: আমার নামে কিছু শুনেছিস? কী বলে লোকেরা?

হাকিমের প্রহার তখনও ভৃত্য ভোলে নি। তাই সে এবার বল্লে, হুজুর, সবাই বলে আপনি একটি পাজী, নচ্ছার, আপনার মতো এতো বড়ো হতভাগা হাকিম নাকি এ তল্লাটে আর আসেনি।

হাস্‌তে লাগলেন হাকিম। বলেন, আভি সাচ বাত্‌ কঁহা। আভী তো মালুম হোতা হ্যাঁয় কী মেরা কাম ঠিক্‌সে চল্‌রহা।

ভৃত্যকে বখশিষ দিলেন একটাকা।

গল্প শেষ করে মনিব বল্লেন: যদি জীবনে উন্নতি চাও, তবে এ কাহিনী মনে রেখো।

* * *

কর্তার উপদেশ সেন অক্ষরে অক্ষরে মানলেন। দুর্ণাম বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রমোশন হলো। দপ্তরের ফাইলে বলা হলো 'মোস্ট এফিসেণ্ট'।

সেদিনকার এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন সেন। এটা তাঁর কর্তার পয়লা নম্বরের উপদেশ, মনিবদের তুষ্ট রাখা। কারণ আজকের সভায় বক্তৃতা দেবেন এক উদীয়মান দেশনেতা, স্বাধীন ভারতে নাগরিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে।

সভা আরম্ভ হবার আধঘণ্টা আগেই সবাই সস্ত্রীক স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করলেন। কেউবা এদিক-ওদিক পায়চারী করতে লাগলেন। ঘুরে ফিরে তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন সেন।

মিসেস্ পাল এদিক-ওদিক পায়চারী করছিলেন। হঠাৎ দেখা পেলেন সেনের। কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললেন: সেন,

'ইউ আর টু নটী'। আমি ঠিক করেছি তোমার সঙ্গে কথাই বলবো না।

বিস্মিত হ'লেন সেন। কী অন্যায় তিনি করেছেন ভেবেই পেলেন না। তাই বললেন, কিন্তু কী করলাম আমি, অন্যায় কিছু করেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

বলো কী, অন্যায় করো নি! রীতিমতো অপমান। সত্যি সেন, 'আই ফীল্ ড্রেডফুল', মিসেস্ পাল জবাব দেন।

: কিন্তু কৈ, কী করলাম, তাতো বুঝে উঠতে পারছিনে। দুঘণ্টা ধরে এখানে অতিথি অভ্যর্থনা করছি, এর আগে তো আপনার সঙ্গে দেখাই হয়নি যে কিছু বলবো, ম্লান হয়ে সেন জবাব দেন।

এবার হাসির পালা মিসেস পালের। বলেন, আঃ সেন, সেই-জন্যেই তো আমি ভয়ানক অপমান বোধ করছি যে তুমি দুঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে দেখাই করো নি। দ্যাটস্ টু ব্যাড।

মিঃ কাপুর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন: পারবেন না সেনকে শোধ্‌রাতে। ও সংশোধনের বাইরে।

উত্তর দেয় স্বয়ং সেন: হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন মিঃ কাপুর। মেয়েরা পুরুষদের শোধরাতে পারে শুধুমাত্র তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে দিয়ে। এর পরে পুরুষের দল হারিয়ে ফেলে সমস্ত জীবনের প্রতি ইন্টারেস্ট। ঐ না হ'লে তাদের জীবন শোধরানো যায় না।

এমনি সময় দেশনেতার আবির্ভাব হয়।

হালদার সাহেব সেনকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কে হে? কখনো তো নাম শুনিনি?

বলেন কী! শুন্‌ছি উনিইতো না কি হবেন ভবিষ্যৎ প্রাইম মিনিস্টার।

: আমি তো ভেবেছিলুম যে কোন অফিসের কেরাণী-টেরাণী কিছু হবে। গেটের সামনে কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে, হল ঘরটা কোথায়? আমি ধমক দিয়ে বলেছি, খুঁজে নিতে পারো না। তা তুমি কি বল্লে? ফিউচার প্রাইম মিনিস্টার। মাই গড্। আই মাস্ট গো এণ্ড এমেণ্ড মাই মিস্টেক।

হালদার সাহেব দৌড়ে সভাপতির টেবিলের দিকে গেলেন।

এবার বক্তৃতা আরম্ভ হলো। দেশনেতা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সঙ্গে লড়াইর একটা পূর্ণ বিবরণী দিলেন। কী করে কাবু করা হয়েছে ব্রিটিশরাজকে। এই লড়াইতে তিনি যে বড়ো একটা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার কথাও ফলাও করে বললেন।

বক্তৃতা শেষে দেশনেতা প্রশ্ন করলেন: ফ্রেণ্ডস্, আমি আপনাদের রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছি। এবার আপনারা আমায় বলুন—'আর ইউ রাইটিস্ট অর লেফটিস্ট'?

সামনের বেঞ্চিতে বসে ছিলেন চিদাম্বরম, স্বামীনাথন, মূর্তি চারীর দল। পরেই বসু মুখুজ্জে। এই প্রশ্নের জবাব কেউ দেন না প্রথমে।

কিছুক্ষণ বাদে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চিদাম্বরম বলে উঠলো: 'নো স্যর। উই আর নিদার রাইটিস্ট নর লেফ্‌টিস্ট। উই আর অল টাইপিস্ট'।

সবাই হাস্‌তে লাগলেন।

* * *

কিছুদিন বাদে তলব পড়লো হেড অফিস থেকে। বোম্বাই 'ফরেন ডেস্কে' লোকের অভাব, তাই আদেশ করা হয়েছে পত্রপাঠ হাজিরা দেবার জন্যে।

যাবার দিন স্টেশনে বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকে এসেছিলেন দেখা করতে। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন সাংবাদিক। অতি অল্প দিনের মধ্যে এদের সঙ্গে হৃদ্যতা গাঢ় হয়েছিল। পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা এদের আছে, এদের সহানুভূতির মধ্যে আছে আন্তরিকতা। এই আন্তরিকতাই আমার দিল্লীর দিনগুলোকে মধুর করে তুলেছিল। সময়ে অসময়ে এদের সঙ্গে চর্চা করেছি রাজনীতির।

এমনি ভাবে হৈ-হল্লায় কেটেছে দিনগুলো। আজ যাবার দিন মনে হতে লাগলো একথাগুলো বার-বার।

ট্রেন ছাড়ার একটু আগে এলো এক ছোট পরিবার—স্বামী, স্ত্রী ও ছোট মেয়ে। কর্তা আর চাপরাশীর তত্ত্বাবধানে মাল উঠতে লাগলো, গৃহিণী হোল্ড-অল খুলে পেতে দিলেন বিছানা।

গাড়ি ছাড়ার সময় হলো, গার্ডসাহেব বাজালেন তার হুইসেল। এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে এলো আমাদের কামরায় একটি বৃদ্ধ, বয়স তার ষাট পেরিয়ে গেছে। ট্রেনের কোথাও ঠাঁই নেই অথচ যাওয়া তার প্রয়োজন। মেয়ের অসুখ করেছে। বাঁচবার কোন আশাই নেই, সেই মর্মে তার এসেছে বাড়ি থেকে। বৃদ্ধ আশ্বাস দিল যে সে পরের স্টেশন মথুরায় নেমে যাবে। শুধুমাত্র দুটি ঘণ্টা চাই আশ্রয়।

কর্তার বিশেষ আপত্তি দেখা গেলো না কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন গৃহিণী।

পাগল আর কী? যতসব চোর ডাকাতকে ঢোকাচ্ছ আমার কম্পার্টমেণ্টে, তারপর মাঝরাস্তায় খুন করে বসুক।

নেমে যাও, রাশভারী কণ্ঠে তিনি বৃদ্ধকে আদেশ দেন।

বৃদ্ধ কাকুতি-মিনতি করে কিন্তু গৃহিণীর মেজাজ তখন সপ্তমে উঠেছে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন।

গৃহিণী এবার সাহস করে এগিয়ে গেলেন, চাপরাশীকে হুকুম দিলেন ওকে বের করে দিতে।

গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। বৃদ্ধ গাড়ির হাতল ধরে রইলো। গৃহিণী এবার বের করলেন একটা টেনিস র‍্যাকেট। ওটা দিয়ে দুঘা লাগালেন পরপর—এরপরে ধাক্কা দিলেন। বৃদ্ধের হাত খসে গেলো, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হুমড়ী খেয়ে পড়লো।

চারদিক থেকে উঠলো সোরগোল, সবাই দৌড়ে এলেন। কিন্তু গাড়ির বেগ তখন বৃদ্ধি পেয়েছে।

গৃহিণী হাঁপাতে লাগলেন, বোঝা গেল তিনি এই রণযুদ্ধে বেশ ক্লান্ত হয়েছেন। এবার তাঁর রাগ পড়লো কর্তার প্রতি। তাঁর অকর্মণ্যতার দোষারোপ করলেন। শাসিয়ে দিলেন, দিল্লীতে ফিরে এসে চাই এর একটা বিহিত। 'উই মাস্ট টেল দি রেলোয়ে চীফ্ কমিশনার'। এর একটা রফা হওয়া প্রয়োজন। স্বাধীন হয়েছে বলে লোকগুলোর কী কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই। আর বিশেষ করে এই রিফিউজীগুলোর। ফার্স্ট-ক্লাস বলে এরা মানতেই চায় না। 'তোর যদি এতোই যাওয়ার প্রয়োজন তো তুই প্লেনে গেলেই তো পারতিস, এখানে জ্বালাতে এলি কেন'?

অনেকগুলো কথা বলে গৃহিণীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট আয়না, পাউডার খুলে নিয়ে নিজের প্রসাধন সমাধান করেন। তারপর দেহ এলিয়ে দিলেন শয্যায়। হাতে রইলো একটা ছ' পেনীর ডিটেকটিভ্ থ্রিলার।

নয়

রোজ ভোরে কারখানার তীব্র বাঁশির ধ্বনিতে বোম্বাই শহরবাসীদের ঘুম ভেঙে যায়। বাড়ির গায়ে গায়ে লাগানো আছে কাপড়ের কল, অদূরে আরব সাগর।

এই শহরে ঋতুর পরিবর্তন হয় কিন্তু মানুষ থাকে চিরন্তন। শহরের উপরে সজল সঘন হয়ে বর্ষা নামে সত্য কিন্তু এ দেখেও মানুষ কবি হয় না। কারখানা তাদের করেছে যন্ত্রের মানুষ।

এখানে সমুদ্রের তটে বসে কেউ কুড়ায় না নুড়ি, কুড়ায় পয়সা। সময় কাটায় লোহালক্কড়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে। তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য এখানে কাউকে আকৃষ্ট করেনি, করেছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

শুধু ব্যবসায়ী নয়, সাংবাদিকের কাছেও বোম্বাই হচ্ছে তীর্থস্থান। এখান থেকে বহু খ্যাতনামা সাংবাদিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে এঁদের দান অতুলনীয়। দিনের পর দিন এঁরা দেশনেতাদের দিয়েছেন অনুপ্রেরণা, দেশবাসীদের দিয়েছেন সাহস। এঁদের দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু যখন লেখা হবে দেশের সংগ্রামের ইতিহাস তখন হয়তো এদের দানের কথা উল্লেখ থাকবে না। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হর্নিম্যানের জীবন।

প্রবাদ ছিল, বোম্বাই প্রদেশের দুজন গভর্ণর। সরকারী ভাবে মালাবার হিলে থাকেন মহারাজ সিং, বে-সরকারী ভাবে দাদারে শিবাজী পার্কের একপ্রান্তে ছিলেন বেঞ্জামিন গাই হর্নিম্যান।

ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হর্নিম্যানের স্থান ছিল পুরোভাগে। জাতে ছিলেন খাঁটি ইংরেজ, কিন্তু মাতৃভূমির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক

বিচ্ছিন্ন করেছিলেন ভারতবাসীদের সঙ্গে বসবাস করবার জন্যে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে হেসে বলেছিলেন, এই দেশ আমার মাতৃভূমি, এ দেশেই আমি মরবো।

কিন্তু সত্যিই যেদিন তিনি মারা গেলেন সেদিন তাঁর সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে এলেন না। এ দেশের প্রতি তাঁর দানের কথা সবাই ভুলে গেলেন।

সংবাদপত্রে হর্নিম্যান্ শিক্ষানবিশী করেছিলেন লর্ড নর্থক্লিফের কাগজে। তারপর কাজ করেছিলেন 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে'।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে হর্নিম্যান এদেশে বণিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র স্টেটস্ম্যানের নিউজ এডিটার হয়ে এলেন। অল্পদিনের মধ্যে সে কাগজকে দিলেন এক নতুন রূপ।

তারপর বাংলা দেশে এলো স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। সেই আন্দোলনের তরঙ্গের ছোঁয়া এসে লাগলো হর্নিম্যানের গায়ে। কাগজের নীতি নিয়ে মনোমালিন্য ঘটলো তাঁর কর্তৃপক্ষ নাইট ব্রার্ডাসের সঙ্গে। হর্নিম্যান স্টেট্সম্যান ছেড়ে দিলেন।

বোম্বাইতে স্যর ফিরোজশাহ মেহ্তা তখন তাঁর নতুন কাগজের জন্যে সম্পাদক খুঁজছিলেন।

বন্ধুরা এসে বললেন হর্নিম্যানের কথা। স্যর ফিরোজ শাহ রাজী হলেন। কলকাতা ছেড়ে হর্নিম্যান এসে আস্তানা গাড়লেন বোম্বাইতে। বার করলেন 'বোম্বে ক্রনীকেল'।

হর্নিম্যানের লেখনী দেশের সংগ্রামে এক নব যুগ এনে দিল। তাঁর লেখনীর ঝাঁঝে সরকার হয়ে উঠলেন ব্যতিব্যস্ত। বেগতিক দেখে সরকার তাঁকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু হর্নিম্যান নাছোড়বান্দা, তিনি লুকিয়ে ফিরে এলেন।

হর্নিম্যানের অনুপস্থিতিতে 'ক্রনীকেলের' হলো অনেক অদল-বদল। কাগজের সম্পাদক হলেন তাঁরই শিষ্য সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী। কিন্তু হর্নিম্যান যখন আবার এদেশে ফিরে এলেন তখন হঠাৎ একদিন ব্রেলভী হলেন গ্রেপ্তার। তাই হর্নিম্যান আবার 'ক্রনীকেলের' সম্পাদক হলেন।

ইতিমধ্যে কাগজের হাতবদল হলো। পার্শী ব্যবসায়ী কামা হলেন এর মালিক।

ব্রেলভী যখন ছাড়া পেলেন তখন কে হবেন কাগজের সম্পাদক, এই নিয়ে তর্ক উঠলো। কথা হলো হর্নিম্যান ও ব্রেলভী দুজনেই হবেন 'ক্রনীকেলের' সম্পাদক। হর্নিম্যানের আপত্তি ছিল না কিন্তু ব্রেলভী এ প্রস্তাবে অরাজী।

ক্রনীকেল ছেড়ে দিলেন হর্নিম্যান। বের করলেন 'বোম্বে সেন্টিন্যাল'। কাগজ বেরুতে লাগলো রোজ বিকেলবেলা।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ভাগে হর্নিম্যান ছিলেন জিন্নার পরম বন্ধু। কিন্তু এ বন্ধুত্ব তাঁর চিরস্থায়ী রইলো না। জিন্নার রাজনীতি-ক্ষেত্রে ডিগবাজী খাবার পর হর্নিম্যান তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন।

বিলেত থেকে ফিরে এসে দিল্লীতে 'ডন' কাগজ প্রতিষ্ঠার সময় জিন্না একদিন হর্নিম্যানকে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন।

চায়ের আসরে কথাটা তুললেন জিন্না। বললেন: হর্নিম্যান, আমি একটা দৈনিক সংবাদপত্র বের করতে চাই। তুমি কি বলো?

: চমৎকার হবে, হর্নিম্যান জবাব দেন।

: 'ক্রনীকেল' কেনা সম্ভব হবে কী? জিন্না প্রশ্ন করেন।

: কী করে বলবো। মালিক কামা'কে এ প্রশ্ন করে দেখো।

: ধরো, যদি নতুন কাগজ আমি প্রতিষ্ঠা করি, তা হলে তার দায়িত্ব তুমি নেবে কী? আমি আমার কাগজের সম্পাদক তোমায় করতে চাই।

: হতে পারি, এক শর্তে। যদি এ কাগজকে তুমি লীগের মুখপত্র না করো, যদি না করো প্রচার এ কাগজের মারফৎ সাম্প্রদায়িকতার বিষ।

অবাক হয়ে যান জিন্না। সবিস্ময়ে বলেন: সে কি! তুমি যে ইংরেজ। আমি জানতুম—

: তুমি ভুলে যেওনা এই দেশকে আমি মেনে নিয়েছি আমার মাতৃভূমি বলে। মাতৃভূমির অমঙ্গল কখনো কী কেউ করে। হর্নিম্যান দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দেন।

এর পরে জিন্না কখনো আর হর্নিম্যানের মুখ দেখেননি বা কথা বলেন নি।

* * *

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে হর্নিম্যানকে তাঁর নিজের হাতে গড়া 'সেন্টিন্যাল' কাগজ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। মালিকের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল অতি তুচ্ছ কারণে। কিন্তু কিছুদিন বাদে মালিক তাঁকে অনুরোধ করলেন কাগজে ফিরে আসবার জন্যে। কিন্তু তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাই জীবনের প্রদীপ নিববার আগ পর্যন্ত তিনি 'সেন্টিন্যাল' ও 'ক্রনীকেলের' দপ্তরে যাননি।

চাকরী ছেড়ে তিনি চেষ্টা করলেন এক নতুন কাগজ বের করার। উৎসাহ দিলেন বোম্বাইর এক ধনকুবের। নতুন কাগজের নাম দেওয়া

হলো 'ভয়েস অব দি নেশন'। কিন্তু নতুন পত্রিকা বের হবার আগেই ধনকুবেরটি সরে পড়লেন। কাগজ বেরুলো না।

এর পরে হর্নিম্যানের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন রইলো কাগজে লেখা। 'ভারতজ্যোতি' কাগজে ধারাবাহিকভাবে তিনি তাঁর জীবনী প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন মালিকের হুকুম হলো এ লেখা কাগজে বেরুবে না। কিন্তু কিছুদিন বাদে তিনি তাঁর মত পাল্টালেন। 'ফিফটী-ইয়ার্স অব জার্নালিজম' ধারাবাহিকরূপে নিয়মিতভাবে 'ভারতজ্যোতি' কাগজে বেরুতে লাগলো। বই প্রকাশের ভার নিলেন থ্যাকার কোম্পানী। কিন্তু সে বই কখনো সমাপ্ত হয়নি, আজো বাজারে বেরোয়নি।

হর্নিম্যান ক্রনাকেল ও সেন্টিন্যাল কাগজ দুটো প্রতিষ্ঠাই করেন নি, এদের তিনি করে তুলেছিলেন জাতির কণ্ঠস্বর। যেদিন তাঁকে লর্ড উইলিংডন এ দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন সেদিন গান্ধীজি লিখলেন, ভারতবাসীকে হর্নিম্যান শিখিয়েছেন মুক্তির বাণী, তিনি আমাদের দিয়েছেন 'ডকট্রিন অব লিবার্টি।' সাংবাদিক মহল তাঁর নাম দিল 'গভর্নর অব ইণ্ডিয়ান জার্নালিজম'।

কিন্তু যেদিন হর্নিম্যান অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে ঢুকলেন সেদিন সবাই 'মুক্তির মন্ত্রদাতাকে' ভুলে গেলেন। তাঁর শয্যাপাশে শুধুমাত্র রইলো তার পুরানো সহকর্মী—সেক্রেটারী কৃষ্ণা প্যাটেল। যে দেশবাসীর জন্যে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন, যাদের দুঃসময়ে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, তারা তাঁর মৃত্যুর সময়ে তাকিয়ে দেখলো না। যখন তাঁর মৃত্যু হলো নার্সিংহোমে, তখন ইঞ্জেকশনের দরুন পঁচিশটি টাকার জন্যে কৃষ্ণা প্যাটেল হর্নিম্যানের বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অসহায় ভাবে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন 'গভর্নর অফ ইণ্ডিয়ান জার্নালিজম' বেঞ্জামিন গাই হর্নিম্যান।

*　　　　*　　　　*

একদিনের কথা আমার আজো মনে আছে। দাদারের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কলকাতায় বদলীর হুকুম এসেছে। কথাপ্রসঙ্গে সাংবাদিকতার কথা উঠলো। তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন: সত্যিই তুমি সাংবাদিক হতে চাও?

হেসে জবাব দিলাম, কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

না, সে কথা নয়। তিনি জবাব দেন, তবে কী জানো আমাদের যুগে সাংবাদিকতা ছিল স্বদেশপ্রেমের প্রতীক, দেশের সেবা। তোমাদের যুগে এটা কী হবে জানি না।

তারপর উঠে দাঁড়ালেন। চোখ তাঁর অশ্রুসিক্ত। বললেন, My dear youngman, if you remain in journalism you must be determined to fight against what you think is unjust. You had better break yourself in a hopeless fight than bend before what you think is wrong.

*　　　　*　　　　*

হর্নিম্যানের যুগ চলে গেছে, ভারতীয় সাংবাদিকতার হয়েছে অনেক পরিবর্তন। যে স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন থাকতো কাগজের প্রতি পাতায়, যে দেশভক্তি সাংবাদিকদের ব্যাকুল করে তুলতো, আজ তার চিহ্ন নেই। বিদ্রূপ করে তাই আজকাল অনেকে বলে থাকেন এ দেশের কাগজগুলো হচ্ছে 'ইণ্ডিয়ান মিরাকল।'

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই এ যুগের কাগজগুলো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের অন্যতম। তার প্রমাণ পেয়েছি বহুবার।

জীবনে অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি যার সঠিক কারণ আজও খুঁজে পাইনি।

মনে আছে একবার। এক সংবাদ সরবরাহ দপ্তরে বসে চা খাচ্ছিলাম, বসে বসে রাজা-উজীরের গল্প হচ্ছিলো। এমন সময় সহকর্মী এক রিপোর্টার এসে উপাস্থিত হলেন। রোববার, কাজকর্ম কম। এমনি সময় রিপোর্টার দেখতে পেলেন যে তাঁর নামে এক নিমন্ত্রণপত্র এসেছে, এক দেশনেতার মৃত্যুবার্ষিকী। স্থান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, সময় রোববার, বিকেল বেলা।

সংবাদ সংগ্রহ করে আমার বন্ধু রপ্ত হয়েছেন। তাঁর জানা আছে এই সব মৃত্যুবার্ষিকী সভায় কী হয়। চোখ বুঁজে তিনি অক্লেশে বলে যেতে পারেন সভাপতির বক্তৃতা, মৃতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভূয়সী প্রশংসা। দেশবাসীর প্রতি আবেদন—মৃতের প্রতি যোগ্য সম্মান দিতে হবে, তাঁর আদর্শকে মেনে নেওয়া, আরো কত কী।

নিমন্ত্রণপত্র নেড়ে চেড়ে দেখলেন আমার বন্ধু। সভাপতির নাম দেওয়া আছে, আর আছে বক্তাদের নাম। এই অবস্থায় তাঁর কী কর্তব্য তিনি তা বিলক্ষণ জানেন।

দপ্তরে বসে বসে বন্ধু দেশনেতার মৃত্যুবার্ষিকী সভার এক বিশদ বিবরণী লিখলেন। এতে রইলো সভাপতির উচ্ছ্বাস, বক্তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। তারপর কাগজে পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন ফলাও করে এ সংবাদ কাগজে বেরিয়ে গেলো। পাঠকবৃন্দ এ খবর অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়লো কিন্তু হকচকিয়ে গেলেন সভার আয়োজনকারীরা। কী করে এ সম্ভব হলো, তারা টের পেলেন না। মৃত্যুবার্ষিকী সভা তো এ রোববারে হবার কথা নয়, হবে সামনের রোববারে।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন টেলিফোন করলেন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে।

হ্যালো, কে বলছেন? নিউজ এডিটারকে চাই।

কী চাই আপনার? এ পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়।

দেখুন আজকের কাগজে অমুক দেশনেতার মৃত্যুবার্ষিকী সভার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। আমি বলছিলুম কী…

কি বলছিলেন? সভা হয়েছে তার রিপোর্ট বেরিয়েছে। এতে বলবার কী আছে শুনি? একটু রুক্ষ ভাবেই এ পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া হয়।

আজ্ঞে না, তবে কী জানেন, মৃত্যুবার্ষিকী সভা তো কাল হবার কথা ছিল না, ওটা হবে আগামী রবিবার। যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা ভ্রম সংশোধন প্রকাশ করবেন।

নিউজ এডিটার অবাক হয়ে যান। তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণপত্র খুলে দেখেন তারিখটা। সত্যিইতো স্পষ্ট লেখা আছে আগামী রবিবার হবে মৃত্যুবার্ষিক সভা। তবে কী করে এই ভুল হলো। ব্যাপারটা কী তাঁর আন্দাজ করে নিতে মুস্কিল হলো না।

এই একটি মাত্র ঘটনা না। এ রকম আরো বহু গল্প শুনেছি বোম্বাইর কফি হাউসে, সাংবাদিকদের বৈঠকে।

এ স্থানটা হচ্ছে রিপোর্টারদের 'রাদেভু'। সবাই মিলে এখানে বসে গল্প করে ঘন্টার পর ঘণ্টা, বর্ণনা করে নিজেদের অভিজ্ঞতা। এই আসরের সভাপতি হতো মালেয়া। জীবনে সতেরোটা কাগজে সে কাজ করেছে, তাই তার অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর। তার জীবনের প্রতি ঘটনাই এক একটি আরব্যোপন্যাস। আমাদের আসরের গতি যখনই মন্থর হয়ে আসতো তখন তাকে

তাজা করে তুলতেন মালেয়া। তার দু-একটা কাহিনী আজও মনে আছে।

ইংরেজের আমল। সরকার বিপদের আশংকা করছেন সুরাট বন্দরে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা আয়োজন করেছেন হরতালের। তাই পুলিশের আয়োজন করা হয়েছে যথেষ্ট। কাগজের সম্পাদক মালেয়াকে পাঠালেন এই হরতাল রিপোর্ট করতে।

ট্রেনে বসে মালেয়ার বেজায় ঘুম পেলো। তাই সে এক লম্বা ঘুম দিলো কিন্তু জেগে উঠে দেখতে পেলো যে ট্রেন সুরাট বন্দর ছাড়িয়ে বরোদায় চলে এসেছে। এই দুই স্থানের দূরত্ব অনেকটা। কিন্তু ফিরে যাবার কোন ট্রেনই তখন নেই। মালেয়া এতে ঘাবড়ালে না, বললে, কুছ পরোয়া নেই। আমি বরোদায় বসেই "কভার" করবো সুরাটের হরতাল। তারপর বসে লিখলে ছয় পাতা টেলীগ্রাম। কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতার 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ'। শহরে শুরু হয়েছে হরতাল এবং সেই সঙ্গে গোলমাল, দোকানপাটও নাকি লুঠ হয়েছে। শোনা যায়, দু'-একটা খুন জখমও হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশ জারী করেছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা। এই কাহিনীতে বলা হলো পুলিশের জুলুম। শুধু তাই নয়, বর্ণনা করা হলো অসহায় নাগরিকদের দুর্দশার কথা। বাজারে তরী-তরকারীর দাম বেড়ে গিয়েছে, গয়লারা নিয়ে আসছে না গাঁ থেকে দুধ।

টেলীগ্রাম যখন দপ্তরে এসে পৌঁছলো, নিউজ-এডিটার পড়ে একটু হক্‌চকিয়ে গেলেন। টেলীগ্রামের গায়ে ছাপ মারা আছে বরোদার, অথচ মালেয়ার যাবার কথা সুরাটে। চীফ সব-এডিটর মন্তব্য করলেন, ওটা টেলীগ্রাফ-মাস্টারের ভুল। ট্রান্সমিশন্ মিস্টেক্ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিউজ-এডিটার মেনে নিলেন এ কথা।

পরদিন ব্যানার হেডলাইন দিয়ে এ খবর বেরুলো কাগজের প্রথম পাতায়। কাগজের বিশেষ সংবাদদাতার বিবরণ। পাঠকবৃন্দ 'সরকারী জুলুমের' খবর পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

এ খবর যখন সুরাটে পৌঁছলো তখন শহরে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। গোলমালের আশংকা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট করেছিলেন সত্য কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি যে বিপদ এতো শীঘ্রই ঘনিয়ে আসবে। শুধু তাই নয়, কড়া পাহারার আয়োজনও হয়েছে, তবু এ গোলমাল কি করে শুরু হলো তিনি ভেবে পেলেন না। অথচ, এই সংবাদের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানেন না। পুলিশ-সুপারকে তিনি টেলীফোন করলেন। তাঁর অবস্থাও তথৈবচ, শহরে হাঙ্গামার হয়েছে অথচ তিনি কিছুই জানেন না। টেলীফোনে তিনি সার্কেল ইন্‌সপেক্টরকে কষে ধমক দিলেন। বললেন, এই হাঙ্গামার কোন খবর কেন তাঁকে দেওয়া হয়নি! সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করতে।

এদিকে শহরে গুজব রটে গেলো যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধেছে সুরাটে। আধ ঘণ্টায় শহরের সব দৈনিকপত্র বিক্রী হয়ে গেলো। দোকান-পসারীর দল ভয়ে-ভয়ে তাদের দোকান বন্ধ করে দিলেন। পাড়ার মধ্যে জটলা শুরু হয়ে গেলো, অমুক পাড়ায় কি হয়েছে—ক'টা লোক হলো 'স্ট্যাব'। এই নিয়েই শুরু হলো বচসা, এর সমাপ্তি হলো হাতাহাতিতে, দু'-এক জনকে পাঠানো হলো হাসপাতালে। ভয়ে বাজার বন্ধ হলো, আনাগোনা বন্ধ হলো গয়লাদের।

এক কথায়, সুরাটে কাগজ পৌঁছবার দেড় ঘণ্টা বাদে, মালেয়া রিপোর্টে যা লিখেছিল, প্রতি অক্ষরে-অক্ষরে তা মিলে গেলো।

সুরাটের হাঙ্গামার ব্যাপার নিয়ে এসেম্বলীর এক মেম্বার এক মুলতুবীর প্রস্তাব আনলেন এসেম্বলীতে।

বরোদা থেকে সুরাটে এসে মালেয়া দেখলো যে সুরাট ভরে গিয়েছে প্রেস-রিপোর্টারের দলে। সবাই তাকে কনগ্রাচুলেট করলে। বললে, 'হোয়াট এ ম্যাগনিফিসেণ্ট স্টোরী'। দপ্তর থেকে পেলো সে নিউজ-এডিটারের তার। বলা হয়েছে, 'ওয়েল ডান্। সেণ্ড থাউজেণ্ড ওয়ার্ডেড কলারফুল ডেসপ্যাচ, এ্যাডিং লোকাল কলার, পাব্লিক রিএকশন।'

বহু সাংবাদিকের সুরাটে সমাগমের হেতু শহরের অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে যেতে লাগলো। প্রতি কাগজেই বেরলো বিভিন্ন খবর। বাধ্য হয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সান্ধ্য-আইন জারী করলেন। তিনি যা আশংকা করেছিলেন তাই ফলে গেলো।

আর একটি ঘটনা। বোম্বাইয়ের এক কাগজের দপ্তর। কাগজের কাটতি আছে কিন্তু মালিক কৃপণ।

দপ্তরের সমস্ত কাজই মালিক নিজে দেখতেন। একদিন দেখতে পেলেন তার এক মফঃস্বল সংবাদদাতা টেলীগ্রাম পাঠিয়েছে একটা বাঘের গল্প নিয়ে। অর্থাৎ কী করে গ্রামবাসীরা পাকড়াও করেছে দুটো বাঘ, তারপর তাদের করেছে হত্যা। ঘটনার বিশদ বিবরণী।

টেলীগ্রাম পড়ে মালিক ক্ষিপ্ত হয়ে যান, ঘটনার জন্যে নয়, টেলিগ্রামের দৈর্ঘ্য দেখে। অর্থাৎ চারপাতা টেলীগ্রামের জন্যে তাঁকে ডাকঘরকে দিতে হবে অনেক টাকা। টাকার পরিমাণ কল্পনা করে মালিক রেগে উঠলেন। পত্রপাঠ মফঃস্বল সংবাদদাতাকে বিদায় দিলেন। সেই স্থানে নিয়োগ করলেন এক নতুন লোক, আর নিউজরুমে আদেশ দিলেন: 'No more Tiger story in my paper.'

ছুমাস নির্বিঘ্নে কেটে গেলো। হঠাৎ মালিক একদিন তাঁর কাগজের প্রথম পাতায় পড়তে পেলেন একটি ছোট সংবাদ। ছু লাইনের খবর।...Raja of Babulabad found Dead......

একবার, ছুবার, তিনবার তিনি সংবাদটা পড়লেন। তারপর বানান করে পড়লেন। না, কোন ভুল নেই ঘটনার। 'বাবুলাবাদের মহারাজা ইজ ডেড্' স্পষ্ট লেখা আছে। সেই সঙ্গে আছে রাজার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ছুর্ধর্ষ এই বাবুলাবাদের রাজা। কে না তাঁর নাম জানে। বসে-বসে ভাবতে থাকেন মালিক। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেন না কেন এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণী দেয়া হয়নি, কী করে হলো তার মৃত্যু, মৃতদেহ কি করে তাঁর দাহ করা হবে ইত্যাদি।

পরদিন বিকেলে মালিক দপ্তরে বসে আছেন। এমনি সময়ে একটি জাঁদরেল চেহারার লোক মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। হাতে তাঁর হান্টার। কী ব্যাপার!

নবাগত ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলেন: আমি কাগজের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মালিক এগিয়ে যান, বলেন, বলুন কী দরকার আপনার? আমিই কাগজের মালিক।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠেন ভদ্রলোক। বলেন, আমি কে জানেন?

: কৈ না তো। মালিক জবাব দেন।

: আমিই সেই বাবুলাবাদের রাজা বাহাদুর, যার মৃত্যু সংবাদ আপনারা কাল কাগজে ছেপেছেন। এটম বোমার বিস্ফোরণেও মালিক এতোটা চম্‌কাতেন না। চেয়ার ছেড়ে একেবারে আঁৎকে উঠলেন, বলেন: কী বল্লেন, আপনিই সেই রাজা বাহাদুর?

কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য, আমি তো ভেবেছিলুম আপনি মরে ভূত হয়ে গেছেন। কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি যে আপনি বহাল তবিয়তে ঘোরাফেরা করছেন। 'ভেরী স্যাড মিস্টেক্‌।'

ওসব মামদোবাজী চলবে না, রাজাবাহাদুর কর্কশ সুরে বলেন। আপনি আমার সুনামের যে 'ড্যামেজ' করেছেন এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জানেন, আপনার ঐ সংবাদ কাগজে প্রকাশ হবার পর আমার কী সর্বনাশ হয়েছে? বাড়িতে সম্পত্তি নিয়ে ছেলেদের মধ্যে বিবাদ লেগেছে, পাওনাদারেরা সবাই এসে টাকার তাগিদ দিচ্ছে, কবে কোথায় কী করেছিলুম, সে সমস্ত ঘটনাও আমার স্ত্রীকে জানানো হয়েছে। লোকসমাজে আমার মুখ দেখানোই ভার হয়েছে। যারা আমার জীবিতকালে প্রশংসা করতো, আমি মরেছি শুনে নিন্দে করতে আরম্ভ করেছে। হ্যাঁ, এখন শুনুন, এই ভুল খবর ছাপবার জন্যে আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে। নইলে কোর্ট তো আছেই, আর এই হাণ্টারটি দেখ্‌তে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আসল হাঙ্গরের চামড়ায় তৈরী। এটারও সদ্ব্যবহার করতে ভুলবো না। হ্যাঁ, ভালো কথা টাকাটা কালকের মধ্যেই আমার সলিসিটরের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এই রইলো তার ঠিকানা।

বীরদর্পে রাজা বাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও মালিক এতোটা হতবাক হতেন না যতোটা এই ঘটনাতে হয়েছিলেন। তিনি তলব করলেন নিউজ-এডিটারকে। কী করে এই ভুল খবর ছাপা হলো তিনি জান্‌তে চান।

তদন্তে প্রকাশ পেলো যে খবরটা পাঠিয়েছিলেন এক মফঃস্বলের সংবাদদাতা, টেলিগ্রাম মারফৎ। সংবাদদাতার সেই প্রেরিত

টেলীগ্রামের 'অরিজিন্যাল' কপি নিয়ে আসা হলো। মালিক টেলীগ্রাম পড়তে লাগলেন।

কিন্তু একী ব্যাপার? এই টেলীগ্রামের প্রেরিত সংবাদ আর প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে যে কোন মিলই নেই। বিস্মিত হ'ন মালিক। এত স্পষ্ট লেখা আছে···

Raja of Babulabad found dead tiger ten feet long near railway crossing···আর তার কাগজে ছাপা হয়েছে Raja of Babulabad found dead.

রাগে জ্বলতে থাকেন মালিক। কে এই নিউজ সব এডিট করেছে। সাব-এডিটারের তলব পড়লো। সাব-এডিটরকে প্রশ্ন করলেন মালিক। বলেন, হ্যাঁহে, টেলীগ্রামে স্পষ্ট লেখা আছে Raja of Babulabad found dead tiger ten feet long···আর তুমি আমার কাগজে ছেপে বসে আছো Raja of Babulabad found dead. বিরসকণ্ঠেই সব-এডিটর জবাব দেয়ঃ কী করবো স্যর, আপনারই হুকুম। তাইতো ও করতে হলো।

: আমার হুকুম, মানে, আমি কী তোমায় ভুল খবর ছাপতে বলেছি?

: না স্যর, আপনি অর্ডার দিয়েছিলেন No more tiger story in my paper. কিন্তু স্যর, টেলীগ্রাফে Found dead শব্দের পর tiger ten feet long শব্দটি ছিল। আপনি হুকুম দিয়েছিলেন বাঘের গল্প ছাপতে পারবে না তাই বাকী শব্দগুলো কেটে দিয়েছি। আর স্যর, শুধুমাত্র Raja of Babulabad found dead বল্লেই স্টোরীটা তেমনি যুৎসই হয় না, সেজন্যেই who's who দেখে ওর একটা আত্মজীবনীও দিয়েছিলাম। গল্পটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং হয়েছিল।

সাব-এডিটরের জবাব শুনে মালিক স্তব্ধ হয়ে যান। কী আর করবেন। রাজাবাহাদুরকে তার খেশারতই দিতে হবে।

*　　　　*　　　　*

এর কম আরো বহু ঘটনা আমি শুনেছি, যা ঘটেছে বর্তমান যুগে। এরপরে যখন এই সমস্ত ঘটনাগুলো মনে হয়েছে তখন ভেবেছি সত্যিই কী আজকালকার কাগজগুলো ইণ্ডিয়ান 'মিরাকল' নয় ?

*　　　　*　　　　*

দশ

জানুয়ারীর মাঝামাঝি দিল্লী থেকে খবর এলো যে গান্ধীজি আবার অনশন করবেন। এটাই হলো তাঁর জীবনের শেষ অনশন। তখনও কেউ ভাবতে পারেনি যে এই অনশনই একদিন হয়ে দাঁড়াবে তাঁর মৃত্যুর কারণ।

তখন দিল্লীতে হত্যার তাণ্ডবলীলা অনেকটা কমে গেছে। তবুও মুসলমানদের শংকা দূর হয়নি। তাই গান্ধীজি এবার সবার এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, দিল্লীর শরণার্থীরা মুসলমানদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তারা তাদের মনের বিষ দূর করতে পারেনি।

একদিন প্রার্থনা-সভায় তিনি এই দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন। 'যদি তারা এমনি ভাবে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়, তবে তারা ভারতের কলঙ্ক বয়ে আনবে, হিন্দুধর্মের অপলাপ করবে। পাকিস্তানে মুসলমানেরা কি করছে সেদিকে দেশবাসীর

তাকালে চলবে না, তাদের তাকাতে হবে এই দেশের বিপন্ন মুসলমানদের প্রতি।'

যদি দরকার হয়, গান্ধীজি বললেন, যদি তোদের ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলতেই হবে। তিনি বললেন, যেদিন দিল্লীতে শান্তি ফিরে আসবে, সত্যিই মুসলমানদের জীবন হবে নিরাপদ, সেদিনই তিনি অনশন ভাঙ্গবেন।

অনশনের দ্বিতীয় দিন গান্ধীজি তাঁর প্রার্থনা-সভায় আর গেলেন না, বক্তৃতা তিনি লিখে পাঠালেন। সেটা পড়ে শোনানো হলো।

এবারও গান্ধীজি ডাক্তার দেখানোয় আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন যে, ভগবানের পায়ে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, কাজেই সামান্য ডাক্তারে তাঁর জীবন রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু বাধা দিলেন ডাক্তার গিল্ডার। বললেন, ডাক্তারদের রোজই বুলেটীন বের করতে হচ্ছে। যদি তারা গান্ধীজিকে পরীক্ষা করার সুযোগ না পায় তবে তাদের বুলেটীনে মিথ্যা খবর লিখতে হবে। মিথ্যার আশ্রয় নিতে গান্ধীজির চিরকালই আপত্তি ছিল। তাই তিনি ডাক্তার দেখাতে রাজী হলেন।

তৃতীয় দিন। গান্ধীজি ভারত সরকারকে অনুরোধ করলেন যে, পাকিস্তানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা ফিরিয়ে দিতে। এ টাকা ছিলো পাকিস্তানের অংশ, দেশ ভাগ হবার দরুণ। গান্ধীজি দাবি করলেন যে এ টাকাটা এক্ষুণি ফিরিয়ে দিতে হবে।

ভারত সরকার পরদিনই টাকা ফিরিয়ে দিলেন। গান্ধীজির শরীর ইতিমধ্যে অবসন্ন হয়ে আসছিলো। প্রার্থনা-সভায় যাবার মতো ক্ষমতা ছিলো না। তাই অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর মারফৎ তিনি বক্তৃতা দিলেন। তিনি আবেদন করলেন যে, অন্যে কি করছে

সেদিকে আমাদের তাকানো উচিত নয়, আমাদের দেখতে হবে যে আমরা ন্যায় কাজ করছি কি না? আমাদের মনের গ্লানি ও বিদ্বেষ দূর করতে হবে।

গান্ধীজি বেশিক্ষণ কথা বলতে পারলেন না, দেহ তাঁর ক্রমশই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলেন যে, এই অনশন তিনি কেন করছেন? দেশে এখন কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নেই, তাই মিছে কেন তিনি কষ্ট করছেন?

তিনি জবাব দিলেন, আজ মুসলমানদের জীবন বিপন্ন হয়েছে। তাদের এই দুঃখ তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছে। এ সব ছোটখাটো ঘটনা-গুলোকে তিনি হাঙ্গামার সামিল বলেই মনে করেন। তাই এগুলোকে তিনি উপেক্ষা করতে পারছেন না।

গান্ধীজি অস্বীকার করলেন যে, তিনি এই অনশন সর্দার প্যাটেলের কার্যকলাপের প্রতিবাদস্বরূপ করছেন।

চতুর্থ দিন। গান্ধীজির শরীর আরো অবসন্ন হয়ে পড়লো। মৌলানা আজাদ তাঁকে আবার অনুরোধ করলেন অনশন ভাঙতে কিন্তু গান্ধীজি মানলেন না। তিনি বললেন, একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর পথপ্রদর্শক। তিনি আজ তাঁরই হাতে। আজ তাঁর আর মৃত্যুকে কোন ভয় নেই।

প্রার্থনা-সভায় তিনি জানালেন যে, ভারত সরকার পাকিস্তানের প্রাপ্য টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে। তিনি আশা করলেন যে, এবার হয়তো কাশ্মীর সমস্যারও একটা সমাধান হবে।

দেশ-বিদেশ থেকে হাজার-হাজার টেলীগ্রাম আসতে লাগলো তাঁর শারীরিক কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করে।

যেদিন থেকে গান্ধীজি তাঁর অনশন শুরু করেছিলেন সেদিনই দিল্লীর নেতাদের মধ্যে এক আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাড়িতে রোজই বসছিলো বৈঠক। দিল্লীতে শান্তি ফিরিয়ে আনা ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন স্থাপন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। শুধু মাত্র একটা কাগজে সই করলে চলবে না, কারণ ওতে গান্ধীজি সন্তুষ্ট হবেন না। বিভিন্ন দলের নেতাগণ তাঁদের অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। পঞ্চম দিনে সবাই মিলে তাঁরা একটা প্রতিশ্রুতির খসড়া তৈরী করলেন। এতে সায় দিলেন সমস্ত দলের নেতাগণ। বলা হলো এতে মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে, নির্ভয়ে সব বিপদসঙ্কুল স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারবে। হিন্দুদের দখলে যে সমস্ত মস্‌জিদ আছে সেগুলোও ফিরিয়ে দেয়া হবে। নেতাগণ গান্ধীজিকে আশ্বাস দিলেন এই সমস্ত কাজ তাঁরা নিজেরাই তত্ত্বাবধান করবেন, কোন মিলিটারীর সাহায্য নেওয়া হবে না।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন তাঁর অনশন ভাঙতে। গান্ধীজি তখন এক বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, দিল্লী হলো ভারতের রাজধানী। এক কথায় সমস্ত দেশবাসী তাকিয়ে আছে দিল্লীর পানে। সমস্ত ভারতবাসীর আজ বোঝা উচিত যে, হিন্দু-মুসলমান-শিখ সব ভাই-ভাই। যতো দিন দেশের লোকেরা এ কথা না বুঝতে পারবে ততোদিন এ দেশের কোন মঙ্গল হবে না।

হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, যাঁরা এই প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের গান্ধীজি অনুরোধ করলেন শুধু দিল্লীর হাঙ্গামা থামানোই তাঁদের দায়িত্ব নয়, দেশের অন্যান্য জায়গায় যে হাঙ্গামা হচ্ছে, তা রোধ করাও তাদের কর্তব্য।

বলতে-বলতে গান্ধীজির চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগলো। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, এই মর্মস্পর্শী আবেদন তাঁদের মনে স্পর্শ করলো। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে ফেললেন।

গান্ধীজি আবার বলতে শুরু করলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর হয়ে এলো ক্ষীণ। সুশীলা নায়ার সেগুলোকে জোরে বলে যেতে লাগলেন।

গান্ধীজি জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি এঁরা তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়েছেন! তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবার জন্যেই কি তাঁরা এই ছলনা করছেন? তিনি নেতাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে, তাঁরা দিল্লীর শান্তি, মুসলমানদের নিরাপত্তা বজায় রাখবেন। যদি তাঁরা তাঁকে এ আশ্বাস দেন তবেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে পাকিস্তানে যাবেন এবং সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবেন।

এবার বক্তৃতা দিলেন মৌলানা আজাদ। তিনি গান্ধীজিকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁরা ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নকে দেখছেন না। এরপরে বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতা গণেশ দত্ত। তিনি গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন তাঁর অনশন ভাঙতে। পাকিস্থানের রাজদূত ও এক শিখ নেতাও বক্তৃতা দিলেন।

একটা ছোট চৌকিতে গান্ধীজি বসে রইলেন, তিনি তখন চিন্তায় মগ্ন। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ বাদে গান্ধীজি জানালেন যে, তিনি তাঁর অনশন ভাঙবেন। এর পরে তাঁকে কোরান এবং পার্শী ও জাপানী ধর্মগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করে শোনানো হলো।

মানু ও আভা গান্ধী এক ভজন গাইলেন। এক গ্লাস কমলা লেবুর রস মৌলানা আজাদ গান্ধীজির হাতে তুলে দিলেন। গান্ধীজি ধীরে-ধীরে সেটা পান করলেন।

সেদিন ভোরবেলা পণ্ডিত নেহরুও সংকল্প করেছিলেন যে, তিনি গান্ধীজির সঙ্গে-সঙ্গে অনশন করবেন। কিন্তু যখন তিনি গান্ধীজিকে কমলা লেবুর রস পান করতে দেখলেন, তখন বিদ্রূপ করে বললেন, না, এবার দেখছি আমার উপোস ভাঙতে হবে।

গান্ধীজি নেহেরুর কথায় খুশিই হলেন বোঝা গেলো। একটু বাদে তিনি নেহরুকে এক চিঠি লিখলেন তাঁর শুভকামনা প্রার্থনা করে।

* * *

দপ্তরের কাজ যখন অনেকটা কমে এলো তখন একদিন দেখা করতে গেলাম ব্রজবাবুর সঙ্গে। ভদ্রলোকের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল। বহুদিন আগে বাংলা দেশ ত্যাগ করে বোম্বাইর বাসিন্দা হয়ে আছেন। প্রথম জীবনে একটা ছোট সরকারী চাকরী নিয়ে আসেন, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাঁর পরহিত করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। বোম্বাই থাকাকালীন এক সাধুপুরুষের সন্ধান পেলেন, মুক্তির দীক্ষা নিলেন তাঁর কাছ থেকে।

এর পরে চাকরী ছেড়ে দিয়ে ব্রজবাবু পরোপকার ব্রত নিয়ে মগ্ন রইলেন। অনেকের সাহায্য নিয়ে তিনি একটা জনকল্যাণ সমিতি খুললেন। সুধীসমাজে পরিচিত হলেন তারই অধ্যক্ষ বলে।

আমায় দেখে ব্রজবাবু খুশিই হলেন। বললেন, ভালোই করেছিস্। আমি আগেই খবর পেয়েছিলুম তুই একটা কাগজে চাকরী নিয়ে আসছিস্। তা মাইনে পাস্ কতো?

ব্রজবাবুর বিশ্বাস যে, পরোপকার ব্রত বা ধর্মে অটুট বিশ্বাস রাখতে হলে আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন। নইলে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা অত্যধিক। তাই যাঁদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাঁদের তিনি

বাণী দেন এই কঠিন ব্রত থেকে নিরস্ত থাকতে। তাই পরিচয়ের প্রারম্ভে তিনি কৌলীন্য যাচাই করে নেন। অতএব এই প্রশ্নের গৌণ কারণ আমার জানা ছিল। তাই মাইনে একটু বাড়িয়েই বললাম, শুনে তিনি খুশিই হলেন। বললেন, তা বেশ বেশ, ভালোই চাকরী করছিস তা হলে। একটু ঘন দুধ খাবি?

শেষের কথাটি শুনে বুঝতে পারলাম যে, কৌলীন্য যাচাইতে উত্তীর্ণ হয়েছি। কোন সন্দেহ রইলো না যে, আমার পদমর্যাদার গ্রেড তিনি ঠিক করে ফেলেছেন।

অসম্মতি জানালাম। ব্রজবাবু বলতে লাগলেন, বুঝলি, মণ্টু, এখানে এসেছিলো একটা দিশী কোম্পানীর কেরাণী হয়ে। এরা যে কেন বিদেশে কেরাণী হয়ে আসে বুঝতে পারি না। এসেই আমায় বললে একটা থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে। তা বাপু, তুই যখন প্রথম এলি তখন সব বন্দোবস্ত করে এলেই তো পারতিস।

ব্রজবাবু এবার কাজের কথা বলেন। পাঞ্জাবের শরণার্থীদের জন্যে একটা রিলিফ টীম শীগ্‌গিরই যাবে দিল্লীতে। সেই উদ্দেশ্যে একটা চ্যারিটি শো হবে কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে। শহরের ধনকুবেররা তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্বয়ং গভর্নরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। বলতে-বলতে হঠাৎ আমায় টেলীফোনের ডাইরেক্টরী আনতে বললেন। ছাখ তো স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের নম্বরটা কি? 'ফাঙ্কসনের' আগে আমায় একবার টেলীফোন করতে বলেছিলেন। এই সব বড়লোকদের খামখেয়ালিপনা নিয়ে আর পারি না।

পুরুষোত্তমদাসের সন্ধান পাওয়া গেলো না। কিন্তু ব্রজবাবু হাল ছাড়লেন না। বোম্বাইয়ের ধনকুবের সবাইকে তিনি টেলীফোন করতে লাগলেন।

টেলীফোন শেষে তিনি আমার দিকে হেসে বললেন, দেখলি তো, চ্যারিটি শো করা সহজ কথা নয়। এই সব 'রইস্' আদমীদের পাকড়াও করার রীতিমতো ক্ষমতা থাকা চাই।

বিদায় নিয়ে আসবার আগে তিনি আমায় বার বার অনুরোধ করলেন যেন চ্যারিটি শো'র দিন উপস্থিত থাকি। বললেন, আমার তো বাপু দেখতেই পাচ্ছিস, চারিদিকে নানান্ ঝঞ্ঝাট। তা তুই-ই একটু মেহনৎ করে এদিকে পা মাড়াস্। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোকে জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলুম, তুই শর্টহ্যাণ্ড জানিস তো?

ও বিদ্যেটা জানা আছে শুনে তিনি সুখীই হলেন। বললেন, ভালোই হলো, সেদিন গভর্নর আসবেন। হয়তো একটা বড়ো রকমের বক্তৃতাও দেবেন। আর তা ছাড়া আমি ভাবছি সেদিন কিছু বলবো। দেখিস্, ভালো করে টুকে নিস্। আর তোর অন্যান্য কাগজের রিপোর্টার বন্ধুবান্ধবদেরও নিমন্ত্রণ কর না।

অনেকগুলো কথা তিনি একসঙ্গে বলেন। আমি আমার যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিই।

দু'দিন বাদে ব্রজবাবু আমার অফিসে টেলীফোন করলেন। বললেন, একটু এদিকে আসতে পারিস, বড্ডো দরকার।

ঘণ্টাখানেক বাদে তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। তাঁর বৈঠকখানায় রীতিমতো একটা ছোটখাটো মিটিং বসে গেছে। সবার মুখই বেশ গম্ভীর।

ব্রজবাবু আমায় দেখে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'তোর অপেক্ষাই ছিলাম। কালকের সব কাগজে একটা ছোট খবর বের করে দিবি। আমাদের চ্যারিটি শো'র দিন পাল্টে গেছে। উঃ, কি করে যে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাবো, তা ভেবেই পাচ্ছি না।

হয়তো এবার গভর্নর আসবেনই না। এদিকে সবাইকে কার্ড পাঠানো হয়ে গেছে। আজ ভোরেও আমায় স্যর রুস্তম টেলীফোন করেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন সব ঠিক আছে তো। ছিলাম তো বেশ পরোপকার ব্রত নিয়ে, কেন যে মিছেমিছি মাথা গলাতে এলাম এই সব ঝঞ্ঝাটের কাজে।'

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, কি হলো আপনার যে চ্যারিটি শো'র দিন বদলে দিচ্ছেন?'

তিনি ভেংচি কেটে বললেন, 'তা দেবো না তো কি নিজেই হিরো সাজবো? ছাখ দিখিনি কাণ্ডখানা। যতো সব স্নবারি। হিরোইনের মা আপত্তি করেছেন হিরোকে নিয়ে। বলে কি না অতো বড়ো অফিসারের মেয়ে, তাকে আমি ঐ ক্লার্কটার সঙ্গে এক্টো করতে দেবো না।'

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন পাশের এক ভদ্রলোক। এই অভিনয়ের হিরোইন অনুরাধা এক বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীর মেয়ে। সদ্য তাঁরা দিল্লী থেকে এখানে বদলী হয়ে এসেছেন। বোম্বাইয়ের সামাজিক আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত ন'ন। আর এই বইয়ের হিরো হলো এক সামান্য কেরাণী। প্রথমে এ ঘটনাটা জানা যায়নি কিন্তু একদিন অনুরাধা টের পেলো যে, হিরো শঙ্কর বড় কেউ নয়। তার মা এ কথা শোনা মাত্র বেঁকে বসলেন। দাবী করলেন যে, কেরাণীর সঙ্গে তাঁর মেয়ে একটিং করতে পারে না। এতে অভিনয় হোক বা না হোক।

বললাম, 'তা বেশ, হিরোইন বা হিরোকে পাল্টে নিলেই তো হয়। সমস্ত ল্যাঠা চুকে যায়।'

'তা বাপু, তুমি তো দু'কথা বলেই খালাস। অনুরাধাকে এই অভিনয় থেকে বাদ দিলে আমার টিকিটের সেল্ যে কমে যাবে! আর তা ছাড়া ওর বাবা হলেন শ্রীশ্রীগুরুদেবের শিষ্য।'

'তা হলে, হিরো শঙ্করকেই বাদ দিন। আরও তো লোক আছে,' আমি বলি।

'না, তা হয় না,' ব্রজবাবুর পাশের ভদ্রলোকটি বলে উঠেন, 'শঙ্করকে বাদ দিলে এই প্লে একদম মাটি হয়ে যাবে। সেবার দাদারে পূজায় ও যা পার্ট করেছিল, তা দেখে সবার তাক্ লেগে গিয়েছিলো।'

উপস্থিত প্রায় সবাই এতে সম্মতি দিলেন।

ব্রজ বাবু বুঝতে পারলেন যে, শঙ্করের দল বেশ ভারী। তিনি এবার রেগে গেলেন। বললেন, 'তা হলে তোমরাই সব করো, আমি এতে নেই। আমি স্যর রুস্তমকে বলে দিচ্ছি। ফাণ্ডের জন্যে আমি টাকা অন্য উপায়েই তুলতে পারবো।' ব্রজ বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এর পরে চ্যারিটি শো নির্ধারিত দিনেই হয়েছিলো, শুধু মাত্র অভিনয়টি হয়নি। কারণ শঙ্করের দল অনুরাধার মার আব্দারে রাজী হ'ননি এবং ব্রজ বাবুও অনুরাধার মাকে রাগাতে সাহস করেননি। গানের জলসা বেশ জমকালোই হয়েছিল। শহরের যাঁরা নামকরা শিল্পী তাঁরা সবাই এসেছিলেন। টিকিটও বেশ বিক্রী হয়েছিলো। পরদিন অবশ্য এর একটা বেশ বড়ো রিপোর্টই প্রতি কাগজে বেরিয়েছিলো। এতে ব্রজ বাবু খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং কিছু দিন বাদে আমায় ধন্যবাদ দিয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন।

এবার দিল্লীর অনশন গান্ধীজিকে অনেক কাহিল করে তুলেছিল। তাই প্রার্থনা-সভায় রোজ তাঁকে চেয়ারে করে নিয়ে আসা হতো। একদিন প্রার্থনা-সভায় এক হৈ-চৈ উঠলো। শুনতে পাওয়া

গেল এক হাতবোমার আওয়াজ। জনতা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো, কিন্তু গান্ধীজি রইলেন অবিচলিত। তিনি সবাইকে শান্ত হতে বললেন।

শোনা গেল যে, এক পাঞ্জাবী শরণার্থী, নাম তার মদনলাল, হাতবোমা ছুঁড়েছে গান্ধীজিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু নিশানা হয়েছে তার ব্যর্থ। আসামী অবশ্য গ্রেপ্তার হয়েছে।

এ ঘটনার উল্লেখ করলেন পরদিন গান্ধীজি প্রার্থনা-সভায়। বললেন, 'এমনি ভাবে হিন্দুধর্ম জিইয়ে রাখা যাবে না। মানব-হত্যা কোন ধর্মকে রক্ষা করতে পারে না। গান্ধীবাদই ধর্ম রক্ষা করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।'

* * *

তারপর এলো ত্রিশে জানুয়ারী। ভারতের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন।

বিকেল সাড়ে চারটা। আভা নিয়ে এলো গান্ধীজির খাবার। এটা হল তাঁর 'লাস্ট সাপার'। সামনে বসে আছেন সর্দার প্যাটেল ও তার মেয়ে মনিবেন। আলোচনার বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে গুজব রটেছে যে সর্দার প্যাটেল ও নেহরুর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। এরা তুজনেই গান্ধীজীর অতি প্রিয় শিষ্য।

একদিকে বল্লভভাই প্যাটেল। বার্দোলইর সর্দার।

গান্ধীজির দেয়া নাম, দিয়েছিলেন বহু পূর্বে, প্রায় পঁচিশ বছর আগে, তখন ভারতের জাতীয় সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চল্‌ছে।

এর মাত্র কয়েক বছর আগে গান্ধীজির সঙ্গে প্যাটেলের পরিচয় হয়েছে।

প্যাটেল ছিলেন আমেদাবাদের এক বর্ধিষ্ণু আইনব্যবসায়ী।

একদিন সেই শহরের এক ক্লাব ঘরে বসে প্যাটেল তাস খেলছিলেন। খেলাটা বেশ জমে উঠেছে। এমনি সময় গান্ধীজি এসে সেই ঘরে ঢুকলেন। প্যাটেল খেলতে খেলতে একবার মাত্র মুখ তুলে তাকালেন গান্ধীজির পানে। ভালো করে তাকালেন না, কোন কথা-বার্তা হলো না। গান্ধীজির নাম তিনি শুনেছেন, কিন্তু এর পূর্বে কখনো দেখেন নি।

এক সপ্তাহ বাদে। এক কনফারেন্সে এই দুই নেতার আবার মিলন হলো।

ট্যাক্সের বিরুদ্ধে গুজরাতের কিষাণদল সংগ্রাম শুরু করেছে।

সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে এই কনফারেন্স বসেছে। ডেকেছেন স্বয়ং গান্ধীজি।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে এই সভা পর্যবেক্ষণ করলেন প্যাটেল। গান্ধীজির কথা-বার্তা শুনে তিনি আকৃষ্ট হলেন। যোগ দিলেন এই স্বাধীনতার সংগ্রামে।

তারপর এলো ১৯২৮। আমেদাবাদের মেয়র নির্বাচিত হলেন প্যাটেল।

হঠাৎ তাঁকে তলব করলেন গান্ধীজি, আদেশ দিলেন বর্দোলই যেতে। সেখানে 'নো ট্যাক্স ক্যাম্পেন' চালাবার হুকুম দেয়া হলো তাঁকে।

ধীরে ধীরে দল গঠন করলেন প্যাটেল। বর্দোলইর কিষাণদের নিয়ে। গাঁয়ের লোকেরা সবাই তাঁকে নেতা বলে মেনে নিলো।

কিন্তু সরকার দেশের এই নিরীহ গোবেচারীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। মাসের পর মাস কেটে গেলো। বর্দোলইর সংগ্রাম রইল অটুট।

কিষাণদের এই আত্মত্যাগ, কষ্ট স্বীকার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

সরকারের কর্মচারীরা চতুর্দিক ঘুরে দেশ শাসন করতে লাগলেন। কিষাণদের মধ্যে কেউ কেউ এসে প্যাটেলকে বললেন: এদের যাবার পথ আটক করে দিলে কেমন হয়; কিংবা যদি রাস্তার মাঝখানে ধারালো লোহা পুঁতে রাখি তা হলে ওরা আর চলতে ফিরতে পারবে না। পারবে না আমাদের উপর অত্যাচার করতে।

এদের ধমকে দেন প্যাটেল। বলেন, আমাদের সংগ্রাম অহিংস। আমরা এই সংগ্রাম শুধু মাত্র ট্যাক্সের বিরুদ্ধে করছিনে, আমরা লড়াই করছি এক নীতির জন্যে। আমরা চাইছি নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে। যদি ওটা বজায় রাখতে পারি তবেই আমরা পাবো স্বরাজ।

এবার দেশের সরকার ঠিক করলেন যে গাঁয়ের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করে দেয়া হবে।

কিন্তু এতেও বর্দোলইবাসীদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। গান্ধীজির আদর্শে তারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এরপরে একদিন সমস্ত হিন্দুস্থান বর্দোলইবাসীদের অভিনন্দন জানিয়ে হরতাল ঘোষণা করলে। দেশবাসী দলে দলে এই হরতালে যোগ দিলেন।

গান্ধীজি নিজে বর্দোলইতে গেলেন। রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে রইল জনতার ভীড়।

"মহাত্মা গান্ধী কী জয়"—জয়ধ্বনিতে আকাশবাতাস হলো মুখরিত।

বর্দোলইর এই অহিংস সংগ্রাম বিলেতের সাংবাদিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো।

বিলেতে হাউস অব্ কমন্সের বৈঠকে সরকারের বিরোধী দলের চাঁইরা এর উল্লেখ করলেন।

কিন্তু সরকার তাঁদের স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে যদি প্রয়োজন হয় তবে তাঁরা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে এই সংগ্রাম বন্ধ করে দেবেন।

অনেকে এসে গান্ধীজিকে অনুরোধ জানালেন বর্দোলইর সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দিতে। তিনি বাধা দিয়ে বললেন: আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজন আজও হয়নি।

৬ই আগস্ট, ১৯২৮। সরকার নতি স্বীকার করলেন। মেনে নিলেন কিষাণদের দাবী, রাজী হলেন বন্দীদের মুক্তি দিতে, ফিরিয়ে দেবেন কিষাণদের জমি-জমা।

সংগ্রামে জয়ী হলেন প্যাটেল। গান্ধীজি তাঁর নাম দিলেন 'বর্দোলইর সর্দার'।

সবার কাছে তিনি পরিচিত হলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নামে।

আর একবার, আমেদাবাদের কোর্টে একটা কেসে বিবাদী পক্ষের উকীল ছিলেন সর্দার প্যাটেল।

জেরা করছেন সর্দার। এমনি সময় কোর্টের পিয়ন এসে তাঁর হাতে একটা টেলীগ্রাম দিল। তিনি টেলীগ্রাম পড়লেন।

তারপর আবার জেরা করতে লাগলেন। একেবারে ভুলে গেলেন টেলীগ্রামের কথা।

বিকেলে কোর্টের কাজ শেষ হবার একটু আগে পকেট থেকে

টেলীগ্রাম বার করলেন। তারপর জজকে বললেন, ইউর অনার, আমার বাড়ি থেকে টেলীগ্রাম পেয়েছি। আমার স্ত্রী মারা গেছেন। কাল আমি কোর্টে আসতে পারবো না। যদি আপনি দয়া করে এ মামলা একদিনের জন্যে স্থগিত রাখেন তবে আমার বড়ো সুবিধে হয়।

কথা শুনে অবাক হ'ন জজ। কৈ, জেরার সময়তো স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে সর্দার একটু বিচলিত হ'ননি। আশ্চর্য!

* * *

অপরদিকে রয়েছেন জওহরলাল নেহরু, গান্ধীজির ডান হাত।

নেহরুকে গান্ধীজি বলতেন, 'শিল্পী।'

অনেক বিষয়ে এঁদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কিন্তু তবু নেহরুকে গান্ধীজি ভালোবাসতেন নিজের ছেলের মতো। নেহরুর কাছে তিনি ছিলেন পিতৃসম।

নেহরু কখনো গান্ধীজির কথা সহজে মেনে নিতেন না। তর্ক করতেন, বোঝাতেন এবং পরিশেষে হার স্বীকার করতেন। কিন্তু তবু গান্ধীজির কাছে নেহরু নিজের মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

রাজনীতির দাবার চাল সম্বন্ধে নেহরু প্যাটেলের মতো দক্ষ ছিলেন না। তিনি দল গঠন কার্যে নিপুণ ছিলেন না কিন্তু তিনি পারতেন মানুষের অন্তরের কাছে আবেদন করতে। তিনি বুঝতে পারতেন মানুষের মনের কথা।

কিন্তু আজ এ দুই দেশনেতার মধ্যে যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে তা দূর করবার দায়িত্ব পড়েছে গান্ধীজির উপর।

* * *

সর্দারের সঙ্গে হাস্তে হাস্তে কথা বল্তে থাকেন গান্ধীজি। এর জবাব দেন সর্দার। এমন সময় আভা এসে জানালো যে প্রার্থনার সময় হয়েছে। হাতঘড়িটা ধরলো গান্ধীজির কাছে।

মুহূর্তের মধ্যে উঠে পড়লেন গান্ধীজি। আভা ও মানুকে নিয়ে প্রার্থনা-সভার দিকে তিনি রওনা হলেন। যেতে-যেতে তিনি রসিকতা করতে লাগলেন ওদের সঙ্গে।

অনেকটা নালিশের সুরেই আভা বললে, 'বাপু, আজকাল আপনি আর আপনার হাতঘড়িটার দিকে নজর দিচ্ছেন না।'

জবাব দেন গান্ধীজি, 'ভয় কি, তোমরাই যে আমার টাইমকিপার।'

মানু হেসে প্রশ্ন করে, 'কৈ এই টাইম-কিপারদের প্রতিও তো নজর দেন না।'

গান্ধীজি হাসেন, কিছু বলেন না।

সেদিন প্রার্থনা-সভায় বেশি লোক হয়নি, মাত্র শ'পাঁচেক লোক ছিল। গান্ধীজি সভায় আসামাত্র সবাই উঠে দাঁড়ালো।

এমনি সময় ভীড় ঠেলে এলো একটি লোক। দেখে মনে হলো, সে গান্ধীজির পদধূলি নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠিক সামনে এসে লোকটা মানুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, তারপর রিভলভার বের করে পর-পর তিনবার গুলি চালালো।

প্রথম গুলিটা লাগল পায়ে, কিন্তু গান্ধীজি দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্বিতীয়টা লক্ষ্য ভেদ করলো। রক্তের ধারা বইতে লাগলো। তাঁর মুখ থেকে শুধু বেরুলো 'হায় রাম।' তৃতীয় গুলিতে দেহ নিশ্চল হলো। চোখ থেকে খুলে পড়লো চশমা।

আভা ও মানু তাঁর মাথা তুলে ধরলো। নিয়ে আসা হলো তাঁকে তাঁর ঘরে। চোখ দুটো আধ-বোজা, মনে হলো যেন ক্ষীণ প্রাণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সর্দার প্যাটেল বাড়িতেই ছিলেন, খবর পেয়ে ছুটে এলেন দৌড়ে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার ভার্গবের তলব হলো। কিন্তু তিনি এসে নিরাশ কণ্ঠে বললেন, 'না, এঁকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই, জীবন-প্রদীপ নিবে গেছে প্রায় দশ মিনিট আগে। ইনি মারা গেছেন।'

চারদিক থেকে উঠল ক্রন্দনধ্বনি।

নেহরু ছিলেন সেক্রেটারিয়েটে। খবর পেয়ে পাগলের মত ছুটে এলেন। মৃতদেহের উপর মাথা রেখে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।

এর পরে সবাই আসতে লাগলেন। এলেন গান্ধীজির পুত্র দেবদাস গান্ধী, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি।

দেশে-বিদেশে আগুনের মতো এই হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লো। বিড়লা-বাড়ির প্রাঙ্গণ হলো জনাকীর্ণ। হত্যাকারী নাথুরাম বিনায়ক গড়সেকে গ্রেপ্তার করা হলো। জাতে সে মহারাষ্ট্রীয়, শোনা গেলো সে পুণার এক কাগজের সম্পাদক।

কিছুক্ষণ বাদে বিড়লা-বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নেহরু জনতার উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা করলেন। চোখ তাঁর অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠ হয়ে এসেছে ক্ষীণ। তিনি বললেন, 'মহাত্মাজী মারা গেছেন, আমরা হারিয়েছি আমাদের নেতা। আজকের দিনে আমরা চতুর্দিকে দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার ও দুঃখ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর আত্মা এই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের পথ দেখাবে।'

গান্ধীজির মৃতদেহ এবার ছাদে নিয়ে যাওয়া হলো। জন-সাধারণের সুবিধার্থে দেয়া হলো সার্চলাইটের আলো। আশ্রম-বাসীরা গীতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

পরদিন ভোরে গান্ধীজিকে পরানো হলো নতুন থানের কাপড়। এ দেহবাস সবার চোখে এনে দিলো জল। কেউ-কেউ অনুরোধ করলেন মৃতদেহ রেখে দেবার জন্যে। যাতে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে সবাই তাঁর শেষ দর্শন পায়। কিন্তু আপত্তি এলো প্যারেলাল ও দেবদাসের কাছ থেকে। দুপুর নাগাদ গান্ধীজির তৃতীয় পুত্র রামদাস গান্ধী এসে পৌঁছলেন। বারোটার কিছু আগে মৃতদেহ শোভাযাত্রা করে রাজঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো।

আগেরদিন সারা রাত্রি ধরে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। এর কোন ত্রুটিই রাখা হয়নি। জাতীয় পতাকা দিয়ে মৃতদেহকে আচ্ছাদিত করে নেয়া হলো, ফুল দিয়ে ঢাকা হলো দেহ। শোভাযাত্রার প্রথম ভাগে রাখা হলো সাঁজোয়া বাহিনীর গাড়ি, এর পরে রইলো রাজপুতানা রাইফেল্‌সের দল। লম্বায় শোভাযাত্রা হলো প্রায় দু'মাইল।

রাজঘাটে শোভাযাত্রা পৌঁছল প্রায় বিকেল সাড়ে চারটায়। কিছুক্ষণ বাদে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের প্লেন এসে মৃতদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টি করে গেল।

তার পর সব হলো শেষ। রামদাস করলেন মুখাগ্নি। সেই ধোঁয়া উঠে গেলো দূরে, বহু দূরে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

শেষ হয়ে গেল একটা যুগ। আজ থেকে শুরু হলো ভারতে এক নতুন ইতিহাস্। কিন্তু যে যুগ চলে গেলো সে থাক্‌বে ইতিহাসে শাশ্বত হয়ে।

এগারো

ডেস্কে বসে নিউজ এডিট করতে-করতে আমার মনে পড়ে পুরানো দিনের কথা। নোয়াখালী, বেলেঘাটা, পাটনা।

আজও মনে আছে কাজিরখিল, শ্রীরামপুর, শ্রীপুরের ক্যাম্পের দিনগুলো।

প্রভাতে প্রাতঃভ্রমণ।

লাঠি ভর দিয়ে ক্ষেতের আল ভেঙে যাওয়া গ্রামের পর গ্রাম।

আতংকগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মনে সান্ত্বনা দেয়া, তাদের মনে সাহস দেয়া।

বিকেল বেলা বসতো প্রার্থনা-সভা, গান হতো 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম'। সেই সঙ্গে থাকতো রবীন্দ্র-সংগীত।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।'

তারপর তাদের কানে দেয়া অহিংসার মন্ত্র।

*   *   *   *

আজ সেই অতীত দিনের স্মৃতি মনে আসে। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল, তাই এসে দপ্তরের ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়ালাম।

সামনেই ফ্লোরা-ফাউণ্টেন—একটু দূরে বোরী বন্দর—ক্রফোর্ড মার্কেট।

এই রাজপথেই একদিন গান্ধীজি পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার তারিখ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে।

দেশে জনসাধারণের তুর্গতি বেড়েছে, জিনিস-পত্রের দাম দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। পয়সা দিয়েও জিনিস মেলেনা। কিষাণরা পাচ্ছেনা তাদের পরনের কাপড়, মিলের মজুরেরা রোজই করছে ধর্মঘট। কিন্তু সরকার দৃঢ়সংকল্প। সরকারের মতে জনসাধারণের তুরবস্থার কারণ হচ্ছে দেশের অরাজকতা। তাই ভাবলেন এমন একটা আইন করতে হবে যা দিয়ে সহজেই এই অসন্তোষ দমন করা যায়। ঠিক হলো 'রৌলাট এক্ট' চালু করতে হবে। এ আইন অনেকটা ভারতরক্ষা আইনের মত।

গান্ধীজী শুনতে পান 'রৌলাট এক্টের' কাহিনী। তিনি অবাক হয়ে যান। দেশে লোক খেতে পাচ্ছে না, আর সরকার এ কী করছেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বর্দোলইর সর্দার, এ কী ব্যাপার?'

'একটা উপায় আছে,' সর্দার জবাব দেন। 'আমাদের সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এই আইনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। দরকার হলে করতে হবে সত্যাগ্রহ।'

সেই দিনই সত্যাগ্রহের জন্য একটা ছোট কমিটি তৈরী হলো। এতে মেম্বার হলেন বেঞ্জামিন গাই হর্নিম্যান, সর্দার প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, ওমর শোভানী ও অনুসূয়া বেন। তৈরী হলো সংগ্রামের খসড়া। সবাই এতে সই করলেন।

কমিটি ঠিক করলেন যে সরকার বই ও কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করার সম্বন্ধে যে আইন করেছেন ওটাই প্রথমে ভাঙতে হবে।

এই নিয়ে নেতাদের মধ্যে প্রতিদিন আলোচনা হতে লাগলো।

তারপর একদিন দেশবাসীর কাছে মহাত্মা আবেদন করেন। সবাইকে এ আন্দোলনে সাহায্য করতে বললেন।

কিছুদিন বাদে স্থির হলো যে দেশব্যাপী এক হরতাল করা হবে। তারিখ ঠিক হলো কিন্তু ভুল করে বসলেন দিল্লীর নেতারা।

যে দিন হরতাল হবার কথা তার সাতদিন আগেই দিল্লীতে হরতাল হলো।

রাজপ্রতিনিধির চোখের সামনে হরতাল!

তাই হরতাল ভাঙতে এলো পুলিশ, মিলিটারী। জনতার সঙ্গে লাগে সংঘর্ষ। গুলি চলে, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিহত হ'ন। রাজধানী থেকে ডাক আসে গান্ধীজির।

মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন।

কিন্তু পথের মাঝে এসে পুলিশ বাধা দেয়। বলে, দিল্লী ও পাঞ্জাবে তাঁর প্রবেশ নিষেধ।

নিজের দেশের মাটি, তবু তাঁর যাবার হুকুম নেই। কারণ সরকারের অভিমত, তিনি আরো গোলমাল সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন।

কিন্তু গান্ধীজি এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। গোলামাল সৃষ্টি করতে নয়, তিনি যাচ্ছেন এক পুরানো নিমন্ত্রণ রাখতে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ কথা শুনতে রাজী নয়। দৃঢ় কণ্ঠে হুকুম দেয়, বলে, বলেছি তো, যাবার হুকুম নেই।

গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হলো। তারপর তাঁকে তুলে দেয়া হয় বোম্বাইগামী এক ট্রেনে।

গ্রেপ্তারের খবর শুনে দেশের সবাই উত্তেজিত হলেন। গোলমালের আশংকা করে বোম্বাই সেনট্রাল স্টেশনে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ওমর শোভানী ও অনুসূয়া বেন। তারা বলেন যে বিরাট জনতা গান্ধীজির জন্যে অপেক্ষা করছে।

গান্ধীজির দর্শন পেয়ে জনতা উল্লসিত হয়। বিরাট জয়ধ্বনি ওঠে: গান্ধীজি কী জয়।

এবার শুরু হলো এক বিরাট প্রসেশান। শহরের চারদিক ঘুরে প্রসেশান এসে হাজির হয় ক্রফোর্ড় মার্কেটের কাছে।

সামনেই পুলিশের দপ্তর। একঝাঁক পুলিশ এসে প্রসেশানের পথ রুখে দাঁড়ায়, বলে : রাজপথ বন্ধ, এগোবার হুকুম নেই।

শুধু কী তাই। সে যুগের পুলিশ। হুম্‌কির সাথে-সাথে চলে লাঠি। এর ব্যতিক্রম এবারও হলো না।

এগিয়ে যাবার অনুমতি গান্ধীজি অবশ্য পেলেন। কিন্তু তিনি এগিয়ে গেলেন না, সোজা গিয়ে দেখা করেন পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে। প্রতিবাদ করেন পুলিশের দুর্ব্যবহারের। কমিশনার রাজার জাত, তিনি অভিযোগ শোনেন আর হাসেন। বলেন : ভেরী স্যরি, ভেরী স্যরি, কিন্তু কী করবো, ডিউটি করতে হবে তো। আমার লোকেরা অন্যায় বড়ো একটা করে না।

পুলিশ দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসে গান্ধীজি সোজা চলেন চৌপট্টিতে। তিনি খবর পেয়েছেন যে অমৃতশহরে, আমেদাবাদে তাঁর গ্রেপ্তারের খবর নিয়ে হৈ-হল্লা শুরু হয়েছে।

তাই এই জনসভায় তিনি হাঙ্গামাকারীদের বকুনি দেন। বলেন, তোমরা যা করছো, সে সত্যাগ্রহই নয়, এ হচ্ছে দুরাগ্রহ।

অহিংসা মন্ত্রের পূজারী তিনি। তিনি কী করে অন্যায়কে বরদাস্ত করবেন।

তিনি যে বহুদিন আগে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে, দক্ষিণ-আফ্রিকায়।

একদিন দারবানে যাবার পথে, রেলগাড়িতে বসে-বসে তিনি রাসকিনের 'আনটু দিস লাস্ট' পড়ছেন। অদ্ভুত বই। তাঁর মতধারার সঙ্গে রাসকিনের মনের মিল আছে দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। মন-

প্রাণ দিয়ে তিনি সারা রাত এই বই পড়েন। তিনি ঠিক করলেন যে এই বইয়ের আদর্শ হবে তাঁরও আদর্শ। এর উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর জীবনকে গড়ে তুলবেন। অহিংসা হবে তাঁর মন্ত্র। এতেই তাঁর জীবন সার্থক হবে।

আজীবন তিনি এই মন্ত্রের উপাসনা করে গেছেন। শাসকের অত্যাচারে তিনি কাহিল হয়েছেন সত্য, কিন্তু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'ননি।

তিনি যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ।

*　　　*　　　*

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ।

দক্ষিণ-আফ্রিকায়ই তিনি সর্বপ্রথম তাঁর অহিংসা মন্ত্রের প্রয়োগ করলেন।

একদিকে প্রবল শক্তিশালী দেশের সরকার।

এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তখনও তিনি 'মহাত্মা' আখ্যা পাননি। এক নগণ্য ভারতীয় আইন ব্যবসায়ী তিনি, কোট-প্যাণ্ট-টাই হাঁকিয়ে তখনো কোর্টে যান।

অত্যাচারী সরকারের জুলুম দিন দিন বাড়ছে। তাই এর প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হয়েছে জোহানস্‌বার্গের ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে।

সরকার ভারতীয়দের হুকুম দিয়েছেন যে তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে নাম লেখাতে হবে, আর বুকপকেটে সবসময়ে রাখতে হবে সরকারের দেয়া এক সনদ। যে এই সনদ সঙ্গে রাখবে না তাকে জেল খাটতে হবে, নয় দিতে হবে জরিমানা।

সভা গম্‌গম করছে। সবাই তাঁদের বক্তৃতা দিলেন, এবার পালা এলো গান্ধীজির।

সবার কাছে তিনি আবেদন জানালেন এই সংগ্রামে যোগ দিতে। একে সফল করে তুলতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে প্রাণ বিসর্জনও দিতে হতে পারে, এ কথাটা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

সভা নিস্তব্ধ, পিন পড়লে তার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যায়। সবাই একাগ্রচিত্তে গান্ধীজির বক্তৃতা শুনছেন।

বক্তৃতা শেষে নেয়া হলো ভোট। সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকার এই কালো আইন তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। জীবন দিয়ে এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন।

কিন্তু দেশের সরকার আইন পাশ করে নিলেন। যাঁর হাতে আছে অপ্রতিহত ক্ষমতা তিনি কী না করতে পারেন!

তাই সংগ্রাম শুরু হলো। সত্যাগ্রহ আন্দোলন। মগনলাল গান্ধী, মহাত্মাজীর আত্মীয়। এই আন্দোলনের নামকরণ তিনিই করলেন। বললেন, 'আচ্ছা একে 'সদাগ্রহ' আন্দোলন বললে হয়না?'

"সদাগ্রহ' নয়, বলুন এ হচ্ছে 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন। অর্থাৎ কিনা সত্যর জন্য আগ্রহ,' বললেন গান্ধীজি।

এই সত্যের প্রতি আগ্রহ তিনি সারাজীবন প্রদর্শন করেছেন। তাঁরই নেতৃত্বে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন এনেছে এ দেশের মুক্তি।

এই আন্দোলন শুরু হ'বার আগে গান্ধীজি একবার লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বড়-বড় কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। 'কলোনিয়্যল' সেক্রেটারী লর্ড এলগিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তারপর ছয় সপ্তাহ ধরে তিনি বিলেতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। সবাইকে বোঝান এই আন্দোলনের মর্মার্থ।

ফিরে আসার পথে তিনি খবর পেলেন যে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছেন যে এই বিল (ট্র্যান্সভ্যাল এন্টিএশিয়াটিক বিল) পাশ করবেন না।

খবর পেয়ে উল্লসিত হ'ন গান্ধীজি। কিন্তু হঠাৎ একদিন ব্রিটিশ সরকারের চালবাজী ধরে ফেললেন। তিনি শুনতে পেলেন যে ব্রিটিশ সরকার নাকি ট্র্যান্সভ্যাল কমিশনারকে বলেছেন যে তারা এই বিল নামঞ্জুর করবেন। কিন্তু দু-দিন বাদে ট্র্যান্সভ্যাল হবে 'ক্রাউন কলোনী'। 'ক্রাউন কলোনী' হিসেবে এই বিল পাশ করিয়ে নিতে তাদের কোন বাধা হবে না।

ব্রিটিশ সরকারের এই চাতুরী দেখে তিনি বিস্মিত হ'ন। তাদের এই নীতিকে তিনি বলেন 'ক্রুকেড পলিসি।'

ইতিমধ্যে ট্র্যান্সভ্যালে আন্দোলন শুরু হয়। সরকারের আদেশ অমান্য করে গান্ধীজিকে দু'মাসের জন্যে জেল খাটতে হলো।

*　　　*　　　*

একদিন কয়েদখানায় বসে গান্ধীজি বই পড়ছিলেন। এমনি সময়ে জেলের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জেনারেল স্মাটস। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন মীমাংসার এক নতুন প্রস্তাব।

স্মাটস বলেন, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নেয়া না নেয়া ভারত-বাসীদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করবে।

এই দুই নেতায় বহুক্ষণ ধরে আলোচনা করেন। স্মাটস রাজী হয়েছেন এই কানুন রদ্ করতে।

স্মাটস যাবার উপক্রম করেন।

কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত। গান্ধীজি প্রশ্ন করেন…

আমি…

কথাটা শেষ হ'বার আগেই স্মাটস জবাব দেন, আপনাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। আপনার যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন।

: অন্যান্য বন্দীদের কী হবে? প্রশ্ন করেন গান্ধীজি।

: তারাও মুক্ত হবে। আমি জেল-কর্তৃপক্ষকে টেলিফোন করছি যেন এক্ষুণি সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয়।

ফিরে যাবার পয়সা নেই গান্ধীজির। স্মাটসের সেক্রেটারী এসে তাঁকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জোহানসবার্গে যাবার পাথেয় তিনিই দিয়ে দেন।

জোহানসবার্গে এসে গান্ধীজি দেখেন যে সেখানে তুমুল হল্লা শুরু হয়েছে। সবাই দাবি করছে যে আগে এই আইন বাতিল করতে হবে, তারপর সবাই নেবে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট। ধীর কণ্ঠে গান্ধীজি বলেন: সত্যাগ্রহী কাউকে পরোয়া করে না। যারা আমাদের বিরুদ্ধবাদী তাদের আমায় বিশ্বাস করতে হবে। অবিশ্বাস করলে চলবে না।

এমনি সময় এক বলিষ্ঠ পাঠান দেখা করতে আসে গান্ধীজির সঙ্গে। নাম তার মীর আলম। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নেয়ার কথা শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়েছে। সে কিছুতেই সার্টিফিকেট নেবে না, জোর গলায় মীর আলম এ কথা বলে।

একদিন গান্ধীজি গেলেন সরকারের খাতায় নিজের নাম লেখাতে। দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট জনতা। তার পুরোভাগে আছে মীর আলম, সেই বলিষ্ঠ পাঠান।

গান্ধীজি এই জনতাকে অভিবাদন করেন। কিন্তু তারা নিরুত্তর।

হঠাৎ মীর আলম এগিয়ে এলো। গান্ধীজির পথ রুখে দাঁড়ায়।

: কোথায় যাচ্ছেন ? মীর আলম প্রশ্ন করে।

: কেন, নাম লেখাতে, ধীরকণ্ঠে গান্ধীজি জবাব দেন।

কিন্তু গান্ধীজির কথা শেষ হবার আগেই মীর আলম লাঠি চালায়।

গান্ধীজি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর মুখ দিয়ে দুটি মাত্র শব্দ বেরুলো, 'হায় রাম !'

বহু বছর পরে, আর একবার এক আততায়ীর নিষ্ঠুর আঘাতে আক্রান্ত হয়ে শুধুমাত্র এই দুটি কথা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। সেদিন ছিল ত্রিশে জানুয়ারী, উনিশ শ' আটচল্লিশ, বিকেল পাঁচটা কুড়ি।

আহত হয়ে হাসপাতালে আসেন গান্ধীজি। জ্ঞান হ'বার পর সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেন, মীর আলম কোথায় ?

: পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

: না না, তাকে মুক্তি দিতে হবে। ও না জেনেশুনে ভুল করেছে। ওর কোন দোষই নেই, গান্ধীজি বলেন।

এই পাঠান জাতিকেই তিনি তাঁর অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন বহুদিন পরে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাত্র কিছুদিন আগে পাঠানদের দেশে গিয়েছিলেন তাদের দীক্ষা দিতে। সঙ্গে ছিলেন খান আব্দুল গফ্‌ুর খাঁন।

* * *

যেদিন তিনি প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে দেখা দিয়েছিলেন সেদিন তিনি ছিলেন এ দেশের কাছে প্রায় অপরিচিত। দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যাপার নিয়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু কেউ তাঁর অপরিসীম

ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত ন'ন। তাই কেউ তাঁকে প্রথমে আমল দেননি।

কংগ্রেস অধিবেশনে আসার পথে তাঁর দেখা হয়েছিল দেশনেতা স্যার ফিরোজ শাহ মেহতার সঙ্গে। তাঁর সমস্ত কথা-বার্তা শুনে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তবু বললেন: গান্ধী, আমার মনে হয় না এই ব্যাপারে কংগ্রেস তোমায় বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারবে। অবশ্য তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তোমার দক্ষিণ-আফ্রিকার রিজল্যুশন গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এর বেশি আমি তোমায় কিছুই প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। আর কী আশ্বাসই বা তোমায় দেবো। দেখতে পাচ্ছো তো নিজেদের দেশে আমরা হচ্ছি গোলাম। আর দক্ষিণ-আফ্রিকা তো পরের দেশ।

ডিসেম্বর মাস, অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসেছে কলকাতায়। অতিথিদের ছাউনী পড়েছে রিপন কলেজে। অন্যান্য দেশনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও ঠাঁই হয়েছে সেইখানে।

সবজেক্টস্ কমিটির বৈঠক শুরু হলো। সভায় গোখলে গান্ধীজিকে নিয়ে গেলেন।

কমিটির সামনে তাঁর রিজল্যুশন রাখা হলো। বক্তৃতা দেবার সময় প্রায় পাঁচ মিনিট।

কিন্তু কিছু বলার আগেই সভাপতির ঘণ্টা বাজলো। গান্ধীজি বসে পড়লেন।

অধিবেশন শেষ হ'বার পর আরো কয়েকটা দিন তিনি কলকাতায় কাটালেন। থাকতেন সেকালের ইণ্ডিয়া ক্লাবে। চারদিক ঘুরে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করলেন।

এই সময়ে লর্ড কার্জনের দরবার হচ্ছিলো কলকাতায়। রাজপ্রতিনিধিকে কুর্ণিশ দিতে এসেছেন বহু রাজা-মহারাজা। তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে গান্ধীজি হাসতে থাকেন। বলেন, এতো খানসামার পোষাক। তারপর এক রাজাকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, বলুন তো এই বিদেশী পোষাক পরে কী আনন্দ পান ?

ঃ আহা আহা, ভুলে যাবেন না, আমরা তো আসলে হচ্ছি লর্ড কার্জনের খানসামা। এই পোষাকে রাজপ্রতিনিধির কাছে না গেলে আমাদের যে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়, সেই রাজা জবাব দেন।

সেদিন তাঁর কলকাতায় আগমন শহরবাসীদের কাছে ছিল অজ্ঞাত। কেউ উল্লসিত হ'ন নি তাঁর আগমনে।

আরও একবার তার আগমনে কলকাতাবাসী আনন্দিত হয়নি।

সেদিন বাংলাদেশে বইছিল উত্তেজনার ঢেউ। এই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন নেতাজী সুভাষ বোস। কংগ্রেসের হাই-কম্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

নতুন কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচনের জন্য নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তিনজনের, মৌলানা আজাদ, নেতাজী বোস ও পট্টভি সীতারামিয়া। অসুখের অজুহাতে মৌলানা আজাদ এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন কিন্তু দৃঢ়তা দেখালেন সুভাষ বোস। তিনি দাবি করলেন ইলেকশনের। তিনি বললেন, 'অন্য স্বাধীন দেশে যেমনি সভাপতির নির্বাচনের জন্যে ইলেকশন হয়, এখানেও তেমনি হওয়ার প্রয়োজন।' এর জবাব দিলেন বর্দোলই থেকে সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনী। তাঁরা মানতে রাজী হলেন না যে, সভাপতি নির্বাচনের জন্য কোন ইলেকশনের প্রয়োজন আছে। চিরপ্রথা অনুযায়ী এই নির্বাচন হবে সর্বসম্মতিক্রমে, বিনা ইলেকশনে। তাঁদের মতে কংগ্রেস

সভাপতি পদের জন্য পট্টভি সীতারামিয়াই যোগ্য ব্যক্তি। এর জবাবে সুভাষ বোস বললেন যে, তিনি প্রত্যাশা করেননি এই নির্বাচন নিয়ে অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যরা এই ভাবে পক্ষ নেবেন। তিনি বললেন, 'যদি সভাপতি নির্বাচন সত্যিই ন্যায়ভাবে হয় তবে ভোট দেবার পূর্ণ স্বাধীনতা সবাইকে দিতে হবে।' সুভাষ বোস জানালেন যে তিনি বামপন্থী নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেও'র জন্য সভাপতির পদ ছেড়ে দিতে রাজী আছেন। এর জবাব দিলেন সর্দার প্যাটেল। তাঁর আগের দাবিকে তিনি সমর্থন করলেন।

এর পরে এক বিবৃতি দিলেন নেহরু। সভাপতির পদ নিয়ে এই বাদানুবাদের তিনি তীব্র নিন্দা করলেন। এই কলহের মধ্যে গান্ধীজি কোন কথা বললেন না, শুধুমাত্র হরিজনে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি এতে কংগ্রেসের দুর্নীতির কথা উল্লেখ করলেন। বললেন, 'এই ভাবে চললে পর কংগ্রেসের মধ্যে বিশৃঙ্খলাই দেখা দেবে, আর কিছু নয়।'

যথাসময়ে নির্বাচন হয়ে গেল, ফলাফল বেরুলে পর দেখা গেলো যে, সুভাষবাবু পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করেছেন। এর দু'দিন বাদে বর্দোলই থেকে এক বিবৃতি দিলেন গান্ধীজি। এতে তিনি বললেন, "পট্টভির পরাজয় আমারই হার।"

সুভাষ বাবুর উদ্দেশে তিনি বলেন : 'I am glad of his victory but the defeat is more mine than his.…After all Subhas Babu is not an enemy of his country. He has suffered for it.'

গান্ধীজির এই বিবৃতি সুভাষবাবুর অন্তরে দুঃখ দিল। তিনি বললেন যে গান্ধীজির আশীর্বাদ পাওয়া হবে তাঁর কাম্য।

'It will be a tragic thing for me. I succeed in winning the confidence of other people but fail to win the confidence of India's greatest man.'

গায়ে জ্বর নিয়ে মার্চ মাসের প্রথমে সুভাষ বাবু ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করলেন। গোবিন্দবল্লভ পন্থ এক প্রস্তাব আনলেন। এতে কংগ্রেস সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো, গান্ধীজির মতানুযায়ী নতুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে।

তারপর এলো খোলা অধিবেশন। অসুস্থতার জন্য নেতাজী বোস অধিবেশনে আসতে পারলেন না। আসন গ্রহণ করলেন মৌলানা আজাদ। সভাপতির ভাষণ পাঠ করলেন শরৎ বোস।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে গোলমাল দেখা দিলো। আনে প্রস্তাব করলেন যে, কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে যে অসুবিধা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো এ, আই, সি, সিতে আবার পাঠান হোক। বাধা এলো নেহরুর কাছ থেকে। তিনি বললেন, আপনারা 'হরিজনে' গান্ধীজির লেখা পড়লে দেখতে পাবেন যে, বর্তমান কংগ্রেসের মধ্যে এই বিবাদের দরুণ তিনি অন্তরে কতো দুঃখ পেয়েছেন। তার কী কারণ? গান্ধীজি আসন্ন সংগ্রামের জন্য দেশকে ও দেশবাসীকে প্রস্তুত করতে চাইছেন।

আনে প্রস্তাব তুলে নিলেন।

অধিবেশনের তৃতীয় দিনে উত্তেজনার বৃদ্ধি পেলো। পণ্ডিত পন্থ এক প্রস্তাবে গান্ধীজির প্রতি আস্থা প্রকাশ করলেন। তিনি আবার দাবি করলেন যে, নতুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজির অনুমতি নিয়ে করা হোক। সমর্থন করলেন রাজাজী। তিনি গান্ধীজির নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করলেন। প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

নেতাজী এই অধিবেশনে পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। এর কারণ তিনি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন যে, গান্ধীজির মত— নতুন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পুরানো সদস্যদের বাদ দেয়া হোক। কিন্তু এই প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি। তাই তিনি অনুরোধ করলেন গান্ধীজিকে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার জন্যে। গান্ধীজি আবার অস্বীকার করলেন এই দায়িত্ব নিতে। সমস্যার কোন সমাধান হলো না দেখে নেতাজী বোস পদত্যাগ করলেন।

নেহরু অনুরোধ করলেন নেতাজী বোসকে এই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে। কিন্তু নেতাজী বোসের কোন মত-পরিবর্তন হলো না। সভায় তুমুল হৈ-চৈ হলো।

পরদিন অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু নেতাজীকে আবার তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে বললেন। এতে সমর্থন দিলেন সরোজিনী নাইডু। কিন্তু নেতাজী বোস অরাজী।

তাই নতুন সভাপতি হলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

*   *   *

বহুবছর আগে গান্ধীজির সঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরিচয় হয়েছিল। সে মিলন হয়েছিলো চম্পারণে এক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

১৯১৭ খৃস্টাব্দ। চম্পারণে নীলকর সাহেবরা তাদের জুলুম বাড়িয়ে যাচ্ছেন। অসহায় চাষীদের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। এদের দুর্দশা নিজের চোখে দেখলেন গান্ধীজি। তিনি ঠিক করলেন যে এম্নি ভাবে আর বিদেশীদের অত্যাচার সহ্য করা যায় না। বিদেশীর শাসনভার থেকে এদেশকে মুক্ত করতে হবে।

লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস অধিবেশন বসেছে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন কংগ্রেসসেবীর।

সভাপতির বেদীর কাছে এম্নি সময়ে এলো এক কিষাণ। নাম রাজকুমার শুকলা, বাড়ি তার চম্পারণে।

রাজকুমার দেখা করতে চায় গান্ধীজির সঙ্গে। অনেক কষ্টের পর তার গান্ধী-দর্শন মিললো।

গান্ধীজি জিজ্ঞাসা করেন : কী চাও ?

রাজকুমার জবাব দেয়—'আপনাকে চম্পারণে যেতে হবে! নিজের চোখে দেখতে হবে আমাদের দুর্দশা।'

: 'আমি কী করে যাবো', জবাব দেন গান্ধীজি। 'দেখতে পাচ্ছো না আমার কতো কাজ। লক্ষ্ণৌ থেকে আমায় যেতে হবে কানপুরে। তারপরে যাবো আরো বহু জায়গায়। না রাজকুমার, আমার হাতে সময় নেই।'

রাজকুমার নাছোড়বান্দা। বলে, 'যেতে আপনাকে হবেই। আজ না হয় কাল। যতোদিন না আপনি চম্পারণে পদধূলি দেন ততোদিন আমি আপনার সঙ্গ ছাড়ছিনে।'

দেশ-ভ্রমণে বেরোন গান্ধীজি। সঙ্গে থাকে রাজকুমার, যেখানেই গান্ধীজি, সেখানেই রাজকুমার।

লোকটার ধৈর্য দেখে গান্ধীজি অবাক হন। বার বার রাজকুমার অনুরোধ করে : আপনাকে চম্পারণে যেতেই হবে। আপনি দিন ঠিক করুন।

অবশেষে রাজকুমারকে আশ্বাস দেন গান্ধীজি। বলেন : আমি যাবো কিন্তু এখন নয়। শিগ্‌গীরই কলকাতায় যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে সেইখানেই দেখা করো।

কলকাতায় এসে দিন কাটায় রাজকুমার। কবে আসবেন গান্ধীজি। তারপর একদিন গান্ধীজি এলেন। রাজকুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গান্ধীজি তাঁর কথা রাখলেন। শুক্লাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন পাটনায়।

পাটনায় গান্ধীজির ঠাঁই হলো এক আইন ব্যবসায়ীর বাড়িতে। বাড়ির মালিক পাটনায় নেই, পুরী গিয়েছেন।

অতএব অতিথির দেখাশোনা বাড়ির চাকর-বাকরেরাই করলো। গৃহস্বামীর নাম রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

সেদিন বিকেলবেলা, গান্ধীজি মজঃফরপুরে চলে এলেন। সেখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন আচার্য কৃপালনীর হোস্টেলে। কৃপালনীজি তখন মজঃফরপুর কলেজের অধ্যাপক। সর্বপ্রথম এই দুই নেতার মিলন হলো।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদও মজঃফরপুরে এলেন।

তারপর কিষাণদের সঙ্গে গান্ধীজি ঘুরে বেড়ান। নিজের চোখে দেখে নিলেন তাদের কষ্ট। কী করে এরা দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুঃখে তিনি ব্যথিত হলেন। বললেন: এই সমস্ত সমস্যার সমাধান আইন আদালতে গিয়ে হবে না। যতোদিন না এ দরিদ্র চাষীদের নীলকর সাহেবদের হাত থেকে মুক্ত করা যায় ততোদিন তাদের এই দুঃখ দূর হবে না।

গান্ধীজি ভেবেছিলেন যে তিনি মজঃফরপুরে মাত্র দু'দিন থাকবেন। কিন্তু পরে বললেন: দু'দিন নয়, এ কাজ করতে গেলে দু বছর সময় লাগবে।

গান্ধীজি নীলকর সাহেবদের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হয় না। প্রতিনিধি বলে: তুমি

কে হে বাপু, এ ব্যাপারে মাথা গলাতে এসেছো। এসব ঘরোয়া ব্যাপার, এ নিয়ে আমরা বাইরের লোকদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইনে। ডিভিশনের কমিশনারের দর্শন-প্রার্থী হ'ন গান্ধীজি। কিন্তু কোন ফল হয় না।

এরপরে গান্ধীজি যান ছোটলাটের কাছে অর্থাৎ প্রদেশের গভর্নরের কাছে। ছোটলাট কিন্তু গান্ধীজির কথানুযায়ী কমিশন গঠনে রাজী হলেন। দীর্ঘ সাত মাসের কঠোর পরিশ্রমের পর তার পুরস্কার মিললো। সরকারী কমিশন বসলো নীলক্ষেতের চাষীদের দুর্দশা নিয়ে তদন্ত করতে। সাহেবদের বিরুদ্ধে পাওয়া গেলো বহু অভিযোগ। বেগতিক দেখে তাঁরা ভড়কে গেলেন। বললেন: রাজী আছি চাষীদের ক্ষতিপূরণ দিতে। কিন্তু কতো?

তাদের মনে মনে ভয় যে গান্ধীজি একটা মোটা টাকা দাবি করবেন। কিন্তু না, গান্ধীজি লাভের পঞ্চাশ ভাগ দাবি করলেন। কিন্তু সাহেবরা লাভের পঁচিশ ভাগ দিতে রাজী। তাদের প্রস্তাব গান্ধীজি মেনে নিলেন।

মীমাংসা হয়ে গেলো। ইতিহাসের পাতায় চম্পারণের নাম লেখা রইলো স্বর্ণাক্ষরে। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর মন ঠিক করে ফেলেছেন, এমনি ভাবে পরাধীন হয়ে, শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা আর নয়, চাই মুক্তি, চাই স্বাধীনতা।

* * * *

এর পরে শুরু হলো মুক্তির সংগ্রাম। দেশের নানা প্রান্ত ঘুরে তিনি মুমূর্ষু জাতির কণ্ঠে দিলেন এই সংগ্রামের বাণী।

এই বাণী তিনি দিয়েছিলেন সর্বপ্রথম কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে। এনি বেশান্ত স্কুল খুলেছেন, সেদিন

ছিল তারই উদ্বোধন দিবস। রাজা-মহারাজারা তাঁদের মহারাণী-দের নিয়ে সভা আলো কারে বসে আছেন। সভা নিস্তব্ধ। এমনি সময় রাজপ্রতিনিধি এলেন। সম্মানের সংগে সবাই উঠে দাঁড়ান।

সভার কাজ শুরু হলো। কিছুক্ষণ বাদে গান্ধীজিকে বলবার অবকাশ দেয়া হলো। গান্ধীজি বলতে শুরু করেন। সবাই শুনতে লাগলেন। গান্ধীজি কাউকে পরোয়া করে কথা বলেন না। দেশের দারিদ্র্যের উল্লেখ করে গান্ধীজি বলেন: আজকে এই সভায় বসে আমার মনে হচ্ছে এ উৎসব হচ্ছে তামাসা। চারদিকে দেখতে পাচ্ছি হীরে, মাণিক, জহরৎ। আমাদের এই হীরে মাণিকের লোভ ছাড়তে হবে। না হলে জাতির মুক্তি নেই।

গান্ধীজির কথা ছাত্রদলকে উত্তেজিত করে তুললো। চারদিক থেকে ধ্বনি উঠলো: হিয়ার, হিয়ার।

অবিচলিত হয়ে গান্ধীজি বলতে লাগলেন। নিস্তব্ধ রইলো সবাই, একমাত্র শোনা যায় গান্ধীজির কণ্ঠস্বর।

শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্য বেড়ে যায়। গান্ধীজি বলতে থাকেন, আমাদের কাউকে পরোয়া করলে চলবে না। রাজা-মহারাজা, বড়লাট, এমন কি সম্রাটকেও ভয় করবো না।

সভাপতিত্ব করছিলেন এনি বেশান্ত, তিনি বাধা দেন। বলেন: এ কী আপনি বলছেন। আপনি চুপ করুন।

: আপনি যদি মনে করেন যে আমার এই বক্তৃতা দেশের মংগলের জন্য নয় তবে আমি আপনার আদেশ মানতে রাজী আছি, গান্ধীজি জবাব দেন।

: কী কী কারণে আপনি এসব বলতে চান? বেশান্ত প্রশ্ন করেন।

: কারণ? বিস্মিত হন গান্ধীজি। কারণ?

কিন্তু গান্ধীজির কথা শেষ হবার আগেই সবাই চীৎকার করতে লাগলো: বলুন, বলুন, আমরা আপনার বক্তৃতা শুনতে চাই।

একদল শ্রোতা, বিশেষ করে রাজা-মহারাজাদের দল সভা পরিত্যাগ করলেন। উত্তেজনা বাড়লো, গান্ধীজিকে বাধ্য হয়ে বক্তৃতা বন্ধ করতে হলো।

কিন্তু সেদিন তিনি যে সংগ্রামের বীজ বপন করেছিলেন তা তাঁরই চেষ্টায় অংকুরিত হয়ে উঠলো অল্প কয়েক দিনের মধ্যে। দেশের যাঁরা ছিলেন নেতা তাঁরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

স্বাধীনতার সংগ্রাম চললো পূর্ণোদ্যমে।

তারপর একদিন এলো জালিয়ানওয়ালাবাগ।

এপ্রিল মাসে রাম-নবমীর দিন অমৃতশহরে ঘটলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সরকার দু'জন কংগ্রেস নেতা, ডাঃ শফীউদ্দিন কিচলু ও সত্যপালকে পাঞ্জাব থেকে বের করে দিয়েছেন। এর প্রতিবাদে হবে এক বিরাট জনসভা।

পরে খবর পাওয়া গেলো যে শহরের এদিকে ওদিকে একটু গোলমাল লেগেছে।

দুদিন বাদে শহরের শাসনকর্তা হয়ে এলেন জেনারেল ডায়ার। এসেই এক হুকুম জারী করলেন যে সভা-সমিতি সব বন্ধ থাকবে। শহরের দু' তিন জায়গায় ডায়ারের এই আদেশ চীৎকার করে পড়ে শোনান হলো।

বহু পরে জানা গিয়েছিল যে এই আদেশ শহরের প্রধান প্রধান এলাকায় পড়ে শোনান হয় নি।

দুপুর বেলা হঠাৎ ডায়ারের কাছে খবর এলো যে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হচ্ছে। স্থান জালিয়ানওয়ালাবাগ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ কোন বাগান নয়, একটা ছোট মাঠ। অনেকটা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের মতো, বহু রাজনৈতিক মিটিং হ'বার দরুণ এর কচি ঘাস লুপ্ত হয়েছে। এই মাঠের চারদিকে ঘেরা রয়েছে দেয়াল। ঢোকবার পথ একটা সংকীর্ণ গলি।

দুপুর বেলা, সাড়ে চারটা। শহরের বহু লোক সভায় যোগ দিতে এসেছে। এমনি সময় আবির্ভাব হলো জেনারেল ডায়ারের। সঙ্গে তার সৈন্য বাহিনী। সভাস্থল থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূরে তিনি তাঁর সৈন্যদের মোতায়েন করলেন। তারপর প্রায় শ'খানেক সৈন্য নিয়ে সভার দিকে এগিয়ে গেলেন। রাস্তা সংকীর্ণ, গাড়ি যাবার পথ নেই, তাই পায়ে হেঁটেই গেলেন। সভার কাছে এসে সোজা হুকুম দিলেন গুলি চালাতে। একবার জনসাধারণকে সতর্ক করার প্রয়োজনও মনে করলেন না। চোখ বুজে সৈন্য বাহিনী গুলি চালাল।

গুলি শেষে দেখা গেলো যে প্রায় পৌনে চারশ লোক মারা গেছে, আহতদের সংখ্যা এগারশোর উপর, একুনে পনেরো শর উপর লোক ডায়ারের গুলি খেলো। যেখানে ভীড় বেশি, ডায়ারের সৈন্যবাহিনী সেই দিকেই গুলি চালাল।

এরপরে একদিন দম্ভ করে ডায়ার তদন্ত কমিশনের কাছে বলেছিল, 'যদি 'বাগের' রাস্তা সরু না হতো তবে তিনি 'আর্মড কার' ও মেশিন গান নিয়ে যেতেন।' মেশিন গান দিয়ে গুলি না চালাতে পেরে তিনি দুঃখ বোধ করলেন। ডায়ার বললেন যে তিনি প্রথম থেকেই ঠিক করে এসেছিলেন যে, গুলি চালিয়ে সভা

ভেঙ্গে দেবেন। কাজেই জনতাকে কোন সতর্ক করার প্রয়োজন মনে করেননি।

গুলি চালনাই জালিয়ানওয়ালাবাগের শেষ অংক নয়। এরপরে শুরু হলো আরো অত্যাচার। এবার জারী করা হলো 'ক্রলিং অর্ডার'। অপরাধ ইংরেজ হেডমিষ্ট্রেস্ মিস শেরউডের হত্যার। বলা হোল যারা মিস শেরউডের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করবে তাদের হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, যে স্থানে মিস শেরউডকে হত্যা করা হয়েছিল সেখানে এক বেদী তৈরী হলো। উপাসনার জন্যে নয়, যারা ডায়ারের হুকুম অমান্য করবে তাদের চাবুক মারবার জন্যে। কোন দিশী লোক গাড়ী, ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবে না। যখন রাস্তায় কোন ব্রিটিশ সৈন্য দেখতে পাবে তখন তাঁদের সেলাম ঠুকতে হবে।'

জালিয়ানওলয়াবাগের কাহিনী এ দেশে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করল। সবাই এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এমন কি সেক্রেটারী অফ ষ্টেট্স লর্ড মণ্টেগুও স্বীকার করলেন যে ডায়ারের এই আদেশ অপমানজনক।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্যর' খেতাব ব্রিটিশ সরকারকে ফিরিয়ে দিলেন। দেশে নেতাদের বসলো বৈঠক, এই দুর্যোগে দেশবাসীর কী কর্তব্য এই হচ্ছে আলোচনার বিষয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে আর এক ইতিহাস রচনা করলেন বেনজামিন গাই হর্নিম্যান। তিনি এই অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রতিদিন তাঁর কাগজে-সম্পাদকীয় লিখতে লাগলেন। ইংরেজ

সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে কর্তারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাজপ্রতিনিধির আমলারা বললেন : 'হর্নিম্যান মাস্ট গো ফ্রম দিস্ কান্ট্রি'। হর্নিম্যান থাকলে এ দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না।'

অতএব হর্নিম্যানকে এ দেশ ছাড়তে হলো।

সমস্ত কাজের দায়িত্ব পড়লো গান্ধীজির উপর। তিনি সংগ্রামকে জোরালো করে তুললেন তাঁর লেখনী ও বক্তৃতার ভিতর দিয়ে। দেশে এলো এক নতুন উদ্দীপনা। জাতীয় আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো।

* * *

এমনি ভাবে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। দেশের যারা হেয়, সমাজে যাদের স্থান নেই তাদের তিনি উচ্চাসনে বসিয়েছেন। বহুবার তিনি এই লাঞ্ছিত, উৎপীড়িতের জন্যে উপোষ করেছেন।

ইংরেজ তখন চাইছে দেশের মধ্যে বিভেদ আনতে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া যতো বাড়ে ততোই তাদের সুবিধে। তাই কথা চলছে দেশে পৃথক নির্বাচন চালু করবার।

একদল মুস্লীম নেতাদের হাত করে নিয়েছে ইংরেজ সরকার। এবার হরিজনদের হাত করতে পারলেই তাদের কারসাজী সফল হয়।

পৃথক 'ইলেক্‌টরেটের' খবর পেয়ে গান্ধীজি তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি তখন ইয়ারভেদা সেণ্ট্রাল জেলে।

সরকারী ভাবে কিছুদিন পরে ঘোষণা করা হলো হরিজনদের জন্যে পৃথক ইলেক্‌টরেটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

গান্ধীজি প্রথমে প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডকে পত্র লিখলেন এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে। লিখলেন: আমি নিজের জীবন দিয়ে আপনার এই ঘোষণাকে রুখবো।

জবাব দেন ম্যাকডোনাল্ড। বলেন: তিনি গান্ধীজির পত্র পেয়ে অবাক হয়েছেন। হরিজনদের স্বার্থ রক্ষার্থেই এই বন্দোবস্ত করা হচ্ছে, হিন্দু জাতি থেকে তাদের ভিন্ন করে দেয়ার কোন সংকল্পই ব্রিটীশ সরকারের নেই।

ম্যাকডোনাল্ড আরো বলেন: গান্ধীজির নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সরকারের ঘোষণাকে প্রতিবাদ করাটা অন্যায়। এ তিনি সমর্থন করতে পারেন না। অবশ্য এতে ব্রিটীশ সরকারের পলিসির কোন অদল বদল হবে না।

গান্ধীজি এর জবাবে বলেন যে হরিজনদের বেশী আসন দিতেও তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের হিন্দুদের থেকে পৃথক করে 'ষ্ট্যাটুটারী সেপারেশন' দিতে তাঁর আপত্তি। যদি সরকারের এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়, তবে এত দিন যাঁরা হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্যে কাজ করেছেন, যাঁরা উৎপীড়িত লাঞ্ছিতদের সমাজে যোগ্য স্থান দিতে চাইছেন, তাঁদের কাজে বাধা পড়বে।

* * *

সরকারের প্রস্তাবের প্রতিবাদে গান্ধীজি ঠিক করলেন উপোষ করবেন।

এ খবরে অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নেহেরু রেগে গেলেন। বললেন, এ কী ব্যাপার, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মেশানো!

কিন্তু নেহরু জানতেন যে গান্ধীজি সময় বুঝে কাজ করেন! কারণ যে দিন দেশে প্রচারিত হলো যে গান্ধীজি হরিজনদের জন্যে

উপোষ করবেন সেদিন দেশব্যাপী এক আলোড়ন পড়ে গেলো। সমস্ত মন্দিরের দ্বার খুলে দে'য়া হ'লো হরিজনদের জন্যে।

*   *   *

রাত্রি দু'টো। কয়েদখানায় বসে গান্ধীজি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্র লিখছেন। আর একটু বাদে তাঁর উপোষ সুরু হবে। হরিজনদের উন্নতির সংকল্পে তাঁর এই উপোষ। যাঁরা গোড়া হিন্দু, দেশের লাঞ্ছিতদের যাঁরা এক কোণে রেখে দিয়েছেন তাদের ভুল তিনি ভাঙ্গাতে চান। তাই উপোষের প্রারম্ভে গুরুদেবের আশীর্বাদ চাইছেন।

গুরুদেব তাঁর আশীর্বাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, এই মহৎ সংকল্পের জন্যে প্রাণ দে'য়াও হবে এক মহান কাজ।

শান্তিনিকেতনে আমবাগানের নিচে দাঁড়িয়ে গুরুদেব পরে তাঁর শিষ্যদের কাছে এই উপোষের তাৎপর্য ব্যাখা করলেন। বললেন, আজ সংসারে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে, আকাশ হয়ে আস্‌ছে অন্ধকার।

এদিকে জেলের আঙ্গিনায় খাটিয়ার উপর শুয়ে আছেন গান্ধীজি। তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করছেন সরোজিনী নাইডু। কিছু দিনের জন্যে এ জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

একদিন জেলের ভিতর দেশ-নেতাদের বৈঠক বসলো। এর জন্যে সরকার বিশেষ অনুমতি দিলেন।

এই সভায় যোগ দিতে এলেন গান্ধীজি।

সভায় স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁর নতুন প্রস্তাব গান্ধীজির কাছে ব্যাখ্যা করলেন। গান্ধীজি বললেন আমি আপনাদের প্রস্তাব চিন্তা করে দেখবো। আমায় একটু ভাবতে সময় দিন।

আম্বেদকরের কাছে জরুরী খবর গেলো। তার আসা চাই এক্ষুণি।

দেশবাসী উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে গান্ধীজি কী করেন। তারপর একদিন ভোরে গান্ধীজি বললেন যে, তিনি চান না হরিজন ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকুক। হরিজনদের হিন্দুর অধীনে রাখা হবে ঘোর অন্যায়। তাই তিনি সপ্রুর প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি হরিজনদের আরো বেশী সিট দিতে রাজী।

যাঁরা কথা-বার্তা চালাচ্ছিলেন তাঁরা গান্ধীজির এই প্রস্তাবে খুসী হলেন। কারণ আম্বেদকর যা চেয়েছিলেন তার বেশী দিতে প্রস্তুত গান্ধীজি।

সেদিনই বিকেল বেলা, আম্বেদকর গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর দুর্বল শরীর, তাই কথা-বার্তা বেশীর ভাগ আম্বেদকরই বললেন।

দাবী করেন অম্বেদকর : আমি চাই আমার ক্ষতিপূরণ।

ধীর কণ্ঠে গান্ধীজি বলেন : আমি আজীবন হরিজনদের উন্নতির জন্য সংগ্রাম করেছি। আজোও করছি। আমায় আপনি বিশ্বাস করুন হরিজনদের মঙ্গলই আমার কামনা।

তিনি সপ্রুর নতুন প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করলেন। এর গলদ ধরিয়ে দিলেন। তিনি বলেন যে এ প্রস্তাব তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি হরিজনদের আরো বেশী সিট দিতে প্রস্তুত। প্রাইমারী ইলেকসনে তাদের নির্বাচন তারাই করবে।

সেদিন কস্তুরবা এ জেলখানায় স্থানান্তরিত হলেন। তিনি এসে দেখতে পান যে আম্বেদকর কথা কইছে গান্ধীজির সঙ্গে। হেসে বলেন, আবার সেই পুরাণো মামুলী কথা।'

এরপরে আম্বেদকর দেশের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে কথা-বার্তা বললেন। তারপর আবার এলেন গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে।

সেদিন দারুণ গরম পড়েছে, একটু বাতাস নেই এমন কি গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। গান্ধীজির ব্লড্ প্রেসার ক্রমেই বাড়ছিল। কথা বলবার শক্তি পর্যন্ত তাঁর নেই। কিন্তু আম্বেদকর তার দাবী বাড়ালেন। মীমাংসা হলোনা। দুদিন বাদে আম্বেদকর আবার অন্যান্য দেশ-নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সুরু করলেন। সারা ভোর এই কথা-বার্তা হলো। অনেক বাদানুবাদের পর বলা হলো যে হরিজনদের সবশুদ্ধ একশো চুয়াত্তরটা আসন দে'য়া হবে।

দুপুর নাগাদ আম্বেদকর আসেন গান্ধীজির কাছে। নতুন প্রস্তাবে গান্ধীজি রাজী কিন্তু বললেন যে 'সেপারেট প্রাইমারী' পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। আম্বেদকর চাইলেন দশবছর।

: হয় পাঁচবছর, নয় আমার জীবন আপনাকে নিতে হবে, স্পষ্ট ভাষায় গান্ধীজি বললেন।

আম্বেদকর অরাজী। আলোচনা ভেঙ্গে গেলো।

এই সময়ে 'নাটকের রঙ্গমঞ্চে আভির্ভাব হলো চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর। গান্ধীজির বিনানুমতিতে রাজাজী এক নতুন প্রস্তাব করেন আম্বেদকরের কাছে। এতে বলা হলো যে 'প্রাইমারী ইলেকসনের' সম্বন্ধে কথা-বার্তা ভবিষ্যতে চিন্তা করে দেখা যাবে।

এই প্রস্তাব নিয়ে রাজাজী আসেন জেলে গান্ধীজির কাছে। তিনি তাঁর কল্পনাকে ব্যাখ্যা করেন।

গান্ধীজি অবসন্ন, কানে ভালো করে শুনতে পান না। তবু বলেন : আপনার প্রস্তাব আবার বলুন। আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছিনে। রাজাজী বলেন।

'এক্সলেণ্ট', গান্ধীজি ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেন। তিনি রাজাজীর প্রস্তাবে রাজী।

গান্ধীজির জীবন রক্ষা পেলো।

শনিবার বিকেল বেলা, ইয়ারভেদা জেলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। গান্ধীজি ছাড়া অন্যান্য হিন্দু ও হরিজন নেতারা এই চুক্তি পত্রে সই করলেন।

পরদিন রবিবার, এক কনফারেন্সে এই চুক্তি সবাই মেনে নিলেন। কিন্তু গান্ধীজি বললেন যে উপোষ তিনি ভাঙ্গবেন না যতদিন না ব্রিটিশ সরকার ম্যাকডোনাল্ড 'ঘোষণা' বাতিল করেন। বিলেতে এই চুক্তির একটা খসড়া পাঠান হলো। সেটা নিয়ে ভারত-বন্ধু সি-এফ এণ্ড্রুজ ও পোলাক্ ব্রিটিশ সরকারের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন

সেদিন ছুটীর দিন। ব্রিটীশ ক্যাবিনেটের কোন সদস্যই লণ্ডনে নেই। ম্যাক্‌ডোনাল্ড গিয়েছেন সাসেক্সে কিন্তু চুক্তির খবর পেয়ে ম্যাক্‌ডোনাল্ড দৌড়ে রাজধানীতে এলেন। খবর পাঠালেন তার অন্যান্য সহকর্মী স্যর সামুয়েল হোর ও লর্ড লোথিয়ানের কাছে। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তাঁদের বৈঠক বসলো।

সোমবার ভোরবেলা, গান্ধীজীর জীবন-প্রদীপ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ক'লকাতা থেকে এসেছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শয্যাপাশে বসে আছেন।

কিছুক্ষণ বাদে ব্রিটীশ সরকারের ঘোষণা জানা গেলো। এই নতুন চুক্তি তাঁরা মেনে নিচ্ছেন। তখন বিকেল পাঁচটা। সূর্যের আলো মিলিয়ে যায়নি, অন্ধকার নেমে আসেনি পৃথিবীর বুকে।

গান্ধীজিকে ঘিরে বসে আছেন গুরুদেব, সর্দার প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু সবাই।

কমলালেবুর রস পান করে গান্ধীজি তাঁর উপোষ ভাঙ্গেন। গুরুদেব গাইলেন এক ভজন সঙ্গীত।

সবার চোখ হয়ে আসে অশ্রুসিক্ত।

*　　　*　　　*

এমনি ভাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সমাজের হেয়দের জন্য সংগ্রাম করেছেন গান্ধীজি। তার উপোষের প্রথম দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সবাই হরিজনদের অভিনন্দন জানালেন। তাদের আলিঙ্গন করলেন।

মতিলাল নেহেরুর স্ত্রী, জওহরলালের মা, স্বরূপরাণী নেহেরু। তিনি ছিলেন গোঁড়াপন্থী। কখনো অন্যের ছোঁয়া জল খেতেন না। কিন্তু সেদিন তাঁর সব বাধা ভেংগে গেল। তিনি হরিজনদের হাত থেকে জলগ্রহণ করলেন।

কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ও হরিজনে বসে একসঙ্গে খাবার খেলো। সমাজে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করলেন গান্ধীজি।

*　　　*　　　*

একদিন আমার এক জার্নালিষ্ট বান্ধবী গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। খাতা বের করে তিনি চাইলেন অটোগ্রাফ্। হেসে গান্ধীজি বললেন: টাকা দাও।'

বান্ধবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জন্যে।'

'বা: রে জানোনা বুঝি, এ টাকা আমার হরিজন ফাণ্ডের প্রাপ্য। বান্ধবী আমেরিকান, একরাশ টাকা বের করে দিলেন।

গান্ধীজি তাকে সহাস্যে প্রশ্ন করেন, 'ক'দিন ধরে এদেশে আছো?'

'প্রায় দু' বছর। ভারতবর্ষের উপর একটা বই লিখবার ফিকিরে আছি।'

হাসতে থাকেন গান্ধীজি। বলেন; বলো কী হে? দু' বছর! Two years is too long for an American to work on a book.'

কথা-প্রসঙ্গে উঠলো মিস ক্যাথরিন মেয়োর কথা। হেসে গান্ধীজি বললেন: মেয়োর পূর্ণ অধিকার ছিল আমাকে quote করার কিন্তু misquote করার কোন অধিকারই তার ছিল না।

বান্ধবী প্রশ্ন করেন 'আচ্ছা, আপনি বলেছিলেন যে আপনার একশো পচিশ বছর বাঁচবার ইচ্ছে আছে?'

'আমি সে আশা ত্যাগ করেছি,' তিনি বান্ধবীকে বলেন।

বান্ধবী এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

: দেখতে পাচ্ছো না এ জগৎ ভরে গেছে হিংসায় ও পাপে। এই অন্ধকার, মারামারির মধ্যে বেঁচে থাকবার আমার কোন অভিপ্রায়ই নেই।

তিনি তকলী কাটতে লাগলেন। তারপর আবার বললেন: অবশ্য, ভগবান যদি ইচ্ছে করেন তবে আমায় দীর্ঘকালই বেঁচে থাক্‌তে হবে।

কিন্তু বিধাতা সে ইচ্ছে করেন নি। একশো পঁচিশ বছরের পূর্বেই তিনি তাঁকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন।

* * *

'ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজ আমি এই পুরাণো দিনের কাহিনীগুলি ভাবতে লাগলাম। মনে হলো যে খবরগুলো আজ দেশের কাগজে রিপোর্ট করলাম, যে সংবাদের উপর কলম চালালাম, শতাব্দী পরে এ হবে ইতিহাস।

একদিন যে দেহ দেখেছি সতেজ, আজ তা বিলীন হয়ে গেলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গে। ধূলির সাথে দেহ হলো একাকার, কণ্ঠ হলো নীরব।

'সেই সুমধুর রামধুন সংগীত হয় তো আর কখনো শুনবো না, 'তাঁর পায়ের চিহ্ন পড়বে না আর কোন হাটে।'

*　　　　*　　　　*

গান্ধী হত্যার খবর স্কুপ করলে প্রমোদ রায়। প্রমোদ তুখোর বুদ্ধিমান রিপোর্টার। গতানুগতিক নিয়মানুযায়ী সেদিনও গিয়েছিল প্রার্থনা সভায়। এমনি এরকম একটা বিরাট সংবাদের প্রত্যাশা সে করেনি। শুধু মাত্র আন্‌তে গিয়েছিল প্রার্থনা সভার বক্তৃতা।

সভার এক নির্জন প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল প্রমোদ। গান্ধীজি আসছেন, সবাই উঠে দাঁড়ালো। এমনি সময়···

তারপরের ঘটনা প্রমোদ বিশ্বাস করতে পারলো না। নিজের চোখে দেখা, তবু কেন যেন এই সমস্ত ঘটনা তার কাছে অবিশ্বাস-যোগ্য বলে মনে হোল।

কিন্তু সময় নষ্ট করলো না প্রমোদ। দৌড়ে গিয়ে টেলিফোনে খবর দিল অফিসকে।

টেলিফোন ধরলেন দপ্তরের নিউজ এডিটার ফার্নাণ্ডেজ।

: হ্যালো, প্রমোদ, কী ব্যাপার ?

: Gandhiji has been shot.

সমস্ত দপ্তরে একটা চীৎকার উঠে। ফার্নাণ্ডেজ নিজেকে সাম্‌লে নে'ন। তারপর প্রমোদকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁলো প্রমোদ। কী করে হলো আরও 'ডিটেল্‌স' চাই। লণ্ডনে পাঠাতে হবে 'কেবল' এক্ষুণি।

প্রমোদ তখনও উত্তেজনায় কাঁপছে।

কিন্তু তেতোক্ষণে ক্রীড মেসিনে ও-হেল-প্রিণ্টারে সমস্ত পৃথিবীময় খবর ছড়িয়ে পড়েছে : "Gandhiji has been shot"

এর একটু পরে আবার খবর গেলো : The doctor has been Summoned.'

ডাক্তার ভার্গব এলেন। কিন্তু গান্ধীজি তখন মারা গেছেন।

তৃতীয় খবর গেলো : Mahatma Gandhi expired.

বোম্বাই দপ্তরে এ কাহিনী রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। দপ্তরের সামনে অগণিত জনতা দাঁড়িয়ে আছে টাট্কা খবরের জন্যে। প্রতি মুহূর্তে আস্ছে তাজা খবর। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন কারণ আততায়ীর নাম জানা যায় নি।

এমন সময় এলো আর এক 'ফ্ল্যাশ'। আততায়ীর নাম নাথুরাম গোডসে।

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক্, তা হলে হত্যাকারী অন্য কোন জাতির নয়, স্বজাতি হিন্দুই বটে।

বহুদিন আগে একদিন গান্ধীজি বলেছিলেন, 'মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। বিছানায় শুয়ে অসুখে ভুগে মরার চাইতে, আমার কাছে নিজের স্বজাতির হাতে মরা দুঃখের নয়। হত্যাকারীর প্রতি আমার কোন অভিযোগ থাকবে না, মনে থাকবে না কোন খেদ। আততায়ী নিজেই একদিন তার ভুল উপলব্ধি করতে পারবে।'

কিন্তু যেদিন গান্ধীজি সর্বপ্রথম এ কথা উচ্চারণ করেন সেদিন তিনি কল্পনা করতে পারেননি যে একদিন এমনি ভাবে তাঁ'কে স্বজাতির হাতে মরতে হবে।

লণ্ডন থেকে খবর পাওয়া গেলো যে প্রতিদ্বন্দ্বী সব সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানই আমাদের কাছে হেরে গেছে।

সেদিন 'ফরেন' ডেস্কে বসে কাজ করলেন নিউজ এডিটার ডাঙ্কান হুপার। বাকী কাজ তত্ত্বাবধান করলেন ওয়াগলে।

দেশের নানা প্রান্ত থেকে টেলিগ্রাম আসতে লাগলো। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'রিএকশন'। দিল্লী থেকে আসতে লাগলো এ হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিক কাহিনী। এই ঘটনার পর প্রমোদ একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পাঠাতে লাগলো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। সে কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লণ্ডনে খবর পাঠাতে লাগলেন ডুন ক্যাম্পবেল।

*　　　*　　　*

বারো

সেদিন কাজ শেষ হলো ভোর চারটার সময়।

উত্তেজনায় কাজ করা গিয়েছিল, কাজেই খিদের জ্বালাটা ঠিক বোঝা যায় নি। কিন্তু যখন সেটা উপলব্ধি করলাম তখন দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার এক সহকর্মী অভয় দিলেন।

বললেন, ভায়া যদি রাজী থাক তবে নিয়ে যেতে পারি এক জায়গায়, সে স্থানের খ্যাতি নেই, তবে অখ্যাতি আছে প্রচুর। এক কথায় বলতে পারো, ওটা হচ্ছে বারবনিতার আড্ডাখানা।

আমার অপর এক বন্ধু খবরটা শুনে উল্লাসিত হলেন। বললেন, ব্রাভো, আমার সমস্ত কথা শুনে মনে হচ্ছে যে খাবারটা হজম হবে।

খিদের প্রবল তাড়নার দরুন এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি করলাম না। এসে উপস্থিত হ'লাম ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে এক

সরাইখানায়। দরজাটা আধ-ভেজানো কিন্তু ভেতরের আলো দেখে বুঝতে পারলাম যে ক্রেতার অভাব নেই।

প্রচুর খাবার নে'য়া হলো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেগুলো নিঃশেষ হয়ে গেলো। আবার খাবার এলো।

হঠাৎ পাশের এক ক্যাবিন থেকে শুনতে পেলাম বহু নারীকণ্ঠের কলধ্বনি।

কিন্তু মনে হলো যেন এর মধ্যে এক স্বর পরিচিত, এ কণ্ঠস্বর যেন কোথায় শুনেছি।

বন্ধুরা আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন। বললেন, ভায়া ঘাবড়ে যেয়োনা। এটা শুধু মাত্র জঠরের খিদে মেটাবার জায়গা নয়, দেহের খিদে মেটাবার জায়গাও বটে। যদি কখনো বোধ করো—

কথাটা শেষ হলো না। সেই ক্যাবিন থেকে কয়েকটা মেয়ে বেরিয়ে এলো। রাত্রের সেই আলোয় এক জনাকে আমার চিনতে অসুবিধে হলো না। সে অলোকানন্দা।

অলোকা আমায় সেখানে দেখে অবাক হলো।

আমার মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখ্ছি। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, বাংলা দেশ থেকে বহু দূরে বোম্বাইর এক অখ্যাত-নামা হোটেলে অলোকাকে দেখ্তে পাবো। আশ্চর্য, অলোকার এই জীবনধারা কখনও আশা করিনি।

অলোকা নিজেই এসে কথা বললো: আমায় এখানে দেখে তুমি অবাক হয়েছো। ওঃ, অনেকদিন তোমায় দেখিনি। দিল্লীর পর তুমি কোথায় আছ, তাও জানতুম না।

অলোকা আজ আমায় 'তুমি' করেই সম্বোধন করলে।

আমি চুপ করে রইলাম।

ও বলতে লাগলো, কী ভাবছো, কেন এই পথে এলাম। কখনো আমায় এই ভাবে দেখ্‌তে পাবে এ আশা করোনি বোধ হয়!

জবাব দিলাম, 'না, কখনো তোমার এই জীবনকে কল্পনা করিনি। আমি জানতুম তুমি অজয়কে ভালবাসো। কিন্তু এখন দেখছি সবই মিথ্যে।'

: হ্যাঁ, ভালোবাসতুম, আব সেই ভালোবাসাই আমার সর্বনাশ করেছে। আমি জানি যে আমার কোন অজুহাতই তুমি মানবে না। বলবে, মিথ্যে কথা। কিন্তু কথা বানিয়ে বলবার কোন অভিপ্রায়ই আজ আমার নেই। যে ইপ্সিত জিনিষ পাবাব জন্যে মানুষ সংগ্রাম করে, নেয় মিথ্যের আশ্রয়, তা পাবার কোন আকাঙ্খাই এখন আমার নেই।'

আমার বন্ধুরা উঠে অন্য টেবিলে গেলো।

অলোকা বলতে লাগলো : ভালো-মন্দের ফিলসফি আজ আর আমায় শুনিও না। আজ এ জীবনের জন্যে দুঃখ হয় না, মনে আসে না গ্লানি। আর হবেই বা কেন? জীবনে ভালো-ভাবে বাঁচবার অধিকাব যেমনি আছে তেমনি মন্দ হয়ে বাঁচবার অধিকারও তো সবার আছে। নইলে জগতে ভালো-মন্দের বালাই থাকতো না।

আমার কণ্ঠস্বরে একটু ঘৃণার আভাস দেখা দেয়। বলি, 'তোমার এই অমৃতবাণী শোনার মতো প্রবৃত্তি আমার নেই। ভোর হয়ে আসছে, আমায় বাড়ী যেতে হ'বে।'

আমি যাবার উপক্রম করি।

অলোকা আমার হাত চেপে ধরে। বলে, 'না তোমায় শুনতেই হবে আমার কথা।'

ওর ছু'চোখ দিয়ে বইতে লাগলো অশ্রুধারা। ও বললো, 'ভাবছো, কেন এই পথে এলাম। আমি জানি তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তবু বলছি—

তুমি যাবার কিছুদিন পরেই আমার জীবনে ছুর্যোগ এলো। মা মারা গেলেন, দাদা সৈন্যবাহিনী থেকে ছাঁটাই হয়ে এসে বাড়ীতে বসে ছিলেন। সবাই আশা করছিল যে ও একটা বড়ো চাকুরী পাবে। কিন্তু ওর সমস্ত আশা আকাঙ্খা চূর্ণ হয়ে গেলো যখন ওর কোথাও কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত একটা দপ্তরের হলো সামান্য কেরাণী। একদিন দাদা আফিস গেলেন কিন্তু আর ফিরে এলেন না। আজও কোথায় আছেন জানি না।

তবু অজয়কে পাবো এই আশা নিয়ে বেঁচে রইলাম। সেদিনের কাহিনী আমার আজও মনে আছে স্বপ্নের মতো।

একদিন বিকেল বেলা, বাড়ীতে বসে আছি, এমন সময় পিয়ন এসে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেলো। অজয়ের মৃত্যু খবর, আচার্য বলে এক ভদ্রলোক টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। টেলিগ্রামটা বাবা পড়লেন, কিছু বললেন না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। শুধু একবার মুখ দিয়ে এক অস্ফুট ধ্বনি বেরুলো, 'জীবনে কাউকেই সুখী করতে পারলাম না।'

তুমি ভাবছো খবর পেয়ে আমি কেঁদেছি। না, মোটেই নয়। প্রথমে কাঁদবার খুব চেষ্টা করলাম, তারপর বিধাতার পরিহাস দেখে খুব হাসি পেলো। কী অন্যায় করেছিলাম যার জন্যে ভগবান আমায় এই শাস্তি দিলেন। টেলিগ্রাম হাতে করে জানালার ধারে বসে রইলাম। রাস্তার অগণিত জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হলো যেন প্রতি মুহূর্তেই অজয়কে দেখতে পাচ্ছি এই জনতার মধ্যে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এলো আঁধার, রাস্তার ক্ষীণ বাতি জ্বলে উঠলো। চারদিক হয়ে এলো নিস্তব্ধ, আমার কাছে সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে এই নিস্তব্ধতা, এই চিন্তাধারা আমার অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো, নির্জনতা হয়ে উঠলো ভয়াবহ।

: আলোটা জ্বালিয়ে দেবো? বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

: না, দরকার নেই, আমি জবাব দিই। আজ যেন এই ঘন তমসাই ভালো লাগছিল।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর আমি আর বাড়ীতে থাকতে পারলাম না।

: আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, বাবাকে বললাম।

আশ্চর্য হয়ে বাবা আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু আপত্তি করলেন না। ভাবছো, এ কি করে সম্ভব। আমি নিজেও আজ ভাবি, এ কি করে করলাম।

ট্রামে উঠে রওনা হলাম এসপ্লানেডের দিকে। রাস্তার মাঝে-মাঝে দেখতে পেলাম সাইনবোর্ড—'জয়েন ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স।' আমার চোখের সামনে অজয়ের মুখ ভেসে উঠলো। সে যে কি অসহ্য যন্ত্রনা, তা আমি কখনো ভুলতে পারবো না।

পরদিন অফিসে গেলাম। বান্ধবীদের সাথে খুব রসিকতা করলাম। সবাই অবাক হলো। জানোত, আমি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, কখনো রসিকতা বড়ো করিনা। সবাই জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁরে, তোর কী হয়েছে রে?'

জবাব দিলাম, 'কৈ কিছুই হয়নি তো।' অজয়ের মৃত্যু খবর ওদের কাছে বললাম না। বিকেলবেলা অফিস থেকে সোজা বাড়ী গেলাম না। আনমনে ধর্মতলার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

হঠাৎ অফিসের বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় এ পথ দিয়ে হাঁটতে দেখে অবাক হলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এদিকে পথ ভুলে আসেননি তো?'

বললাম, না, 'পথভ্রষ্ট হয়ে এসেছি।'

বিজনবাবু আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

বহুদিন ধরে বিজনবাবু আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমাবার ফিকিরে ছিলেন। কিন্তু কোনদিকে তাঁকে প্রশ্রয় দিইনি। আজকে আবার আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'এদিকটা বড্ডো ভীড়। চলুন না, ময়দানের দিকে যাই। অনেকটা ফাঁকা।'

'আপত্তি করলাম না। বললাম, বেশ তো চলুন।'

বিজনবাবু বিস্মিত হলেন কারণ আমার সাহচর্য তিনি কখনো প্রত্যাশা করেন নি।

রেড রোড দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। লড়াইর সময় এ রাস্তাটা ছিল এরোড্রম। মনে আছে অজয় একবার তার 'ফাইটার প্লেন' নিয়ে এই রাস্তার উপর নেমেছিল। লড়াইর শেষে একদিন গল্প করতে করতে ও আমায় একথা বলেছিল। আজ এ পথ দিয়ে হাঁটতে হাটতে আমার সেই পুরানো স্মৃতি মনে পড়লো।

বিজনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, অলোকাদেবী, আপনাকে বড্ডো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার?

: কিচ্ছু না, আচ্ছা বিজনবাবু, আমায় সিনেমায় নিয়ে যেতে পারেন? মনটা ভালো লাগছে না!

এই কথাটা আমার নিজের কানেই কর্কশ শোনালো। বিজনবাবু অবাক হলেন সত্য, কিন্তু সানন্দে রাজী হলেন। আমার এই 'অফার' তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত।

সেদিন সিনেমার পর রেষ্টুরান্টে গেলাম।

তার পরের কাহিনী বলে তোমার মন ভারাক্রান্ত করতে চাইনে। কারণ সে জীবন এমন গৌরবজনক নয়, যা তোমায় বলতে পারি। কিন্তু এইটুকু বলতে পারি যে আমার জীবনের কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে, যে এ রূপকথা, এম্নি ঘটনা কারু জীবনে ঘটে না। কিন্তু আমি জানি যে আমার কাহিনী সত্য। জীবনে যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম তা পাইনি, কিন্তু যা চাইনি, তা পেয়েছি অতি সহজে।

ব্যঙ্গ করে বললাম: 'রীতিমতো দার্শনিক হয়ে পড়েছিলে দেখছি।'

"হ্যাঁ তাই। আমাদেব মত্যে জীবনকে ভিত্তি করেই তো মনীষীরা কাব্য লেখেন, দার্শনিক বলে আখ্যা পান, জগতে নাম হয়। কিন্তু আমাদের হয় অজ্ঞাতবাস। আমাদের কেউ জানে না। আমি জানি তুমি আমার এ কথা বিশ্বাস করতে পারছো না। ভাবছো, বানানো কথা। কিন্তু বহুদিন ধরে আমার এই কথা পুঞ্জীভূত ছিল মনে, কাউকে বলিনি। আজ তোমায় বললাম। তোমার সাথে যে কখনো এমনি ভাবে দেখা হবে, ভাবিনি।"

অলোকা বলতে থাকে: "নিজের জীবনের অন্য দুঃখকে ভুলতে পারতাম অজয়কে পেলে। কিন্তু আমার জীবনে দুঃখ যেন এলো বন্যার মতো। তার স্রোতে আমি ভেসে গেলাম। জীবনের পশ্চাতে যে কখনো তাকাইনি, এমন নয়। তাকিয়েছি, কিন্তু যখন পেছনে তাকালাম তখন আমি অনেক দূরে। তখন ভাবলাম, কি হবে জীবনে নিষ্ঠার পুজো করে যখন আমার সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

একবার ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করবো, কিন্তু সে করবার মতো দুঃসাহস আমার ছিলো না। আজ বাজারে বারবনিতা বলে নাম কিনেছি। যারা দিনে আমায় দেখে হাসে, তারা কিন্তু রাত্রে সোহাগ করে।"

আমি জবাব দিই, 'যাঁরা উচ্ছৃঙ্খল জীবন নেবার নজীর দেয় প্রেমের ব্যর্থতার, তাদের প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধাই নেই।'

এ কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। শুনে অলোকার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। শুধু বললো, 'জীবনে যদি কখনো গভীর ভাবে ভালোবাসো, তবে তার ব্যর্থতার দুঃখ বুঝতে পারবে। তোমরা যারা উপদেশ দাও তারা কেন তলিয়ে দেখো না নিজের জীবনকে? ভেবে দেখো না কেন যে, জীবনে এমনি দুর্যোগ এলে তোমরা কি করতে? যাক্, তোমায় আমি বিরক্ত করতে চাই নে, কারণ আমি জানি যে আমার এ কাহিনী তোমার কাছে বাংলা দেশে সিনেমার প্লটের মতো শোনাবে। তবে তোমায় একটা কথা বলতে পারি, আমরা মেয়েমানুষ, আমরা সব ভুলতে পারি, পারি না শুধু ভুলতে প্রথম প্রেম ও প্রেমাস্পদকে। নিজের জীবনে যদি কোন মেয়েকে ভালোবাসো, তবে এ কথাটা মনে রেখো।'

অলোকার বন্ধুরা বাইরে দেরী করছিল। ও ওদের কাছে চলে গেলো। আমি ষ্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার স্তব্ধতা ভাঙ্গলো বন্ধুর ডাকে। বললে, 'ভয় নেই ব্রাদার, এদের এখানে আগমন প্রতিদিনের। আজ যাঁর সঙ্গে পরিচয় করলে তাঁর সাথে প্রণয়ের বহু অবকাশ তুমি পাবে। চলো, আজ বাড়ী যাওয়া যাক্।"

প্রায় ভোর হয়ে এসেছিল। আমি বাড়ী চলে এলাম

তেরো

"অপারেশন হায়দ্রাবাদ।" দেশের কাগজগুলিতে অনেক দিন ধরে এই সম্বন্ধে মন্তব্য চলছিল। তাঁদের অনুযোগ যে ভারত-সরকার নিজামকে অনেক সময় এবং সুবিধা দিয়েছেন এর একটা মীমাংসায় পৌঁছবার জন্য। কিন্তু সুদীর্ঘ দিনের আলাপ-আলোচনার পরও যখন সমস্যার কোন সমাধান হয়নি তখন 'অপারেশন হায়দ্রাবাদই' সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, বিশেষ করে সাংবাদিকদের পক্ষে। হায়দ্রাবাদ থেকে বাইরে খবর পাঠানো ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। এই খবর পাঠাতে যেয়ে বিপদে পড়লেন আওরঙ্গাবাদের এসোসিয়েটেড প্রেসের ম্যানেজার। রজাকারদের কুচকাওয়াজ সম্বন্ধে সে এক কাহিনী পাঠিয়েছিল। এই খবর পেয়ে নিজাম সরকার তাকে আটক করলেন আর আওরাঙ্গাবাদের এ, পি, আই'র অফিসকে করা হলো তালাবন্দী।

এই ব্যাপার অনুসন্ধান করার ভার দেওয়া হলো ওয়াগলকে। সহকারী হিসেবে আমায় সঙ্গে যেতে হলো। মানমাদে গাড়ী বদল করে ছোট লাইন ধরে দুপুর নাগাদ আওরাঙ্গাবাদে এসে পৌঁছলাম। অনেক তল্লাসী করে খোঁজ পাওয়া গেলো এ, পি, আই'র দপ্তর। কিন্তু অফিস জনমানবশূন্য, ম্যানেজারকে করা হয়েছে আটক, চাপরাশীর দলও হয়েছে নিখোঁজ। ঘটনার পূর্ণ বিবরণী বলবার মতো কাউকে পাওয়া গেলো না।

তাই হায়দ্রাবাদ এসে ঘটনার তদন্ত করা গেলো। কিছুটা খবর পাওয়া গেলো অসকার রেবেরোর কাছ থেকে। অসকার হায়দ্রাবাদে এ, পি, আইর ম্যানেজার। সেকালে নিজাম সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এ, পি আই, ক্রীশ্চান কিংবা মুসলমান ছাড়া কাউকে হায়দ্রাবাদ ব্যুরোর মানেজার করতে পারতেন না। অস্‌কার হায়দ্রাবাদ পরিস্থিতির একটা বিবরণী আমাদের দিলে। বললে, 'নিজাম নাছোড়বান্দা, ভারত সরকারের সঙ্গে কোন চুক্তি করতেই রাজী নয়।'

নিজামের এই মনোভাব নতুন কিছু নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর যখন ভারত সরকারের সঙ্গে একটা মীমাংসার প্রশ্ন উঠলো তখন নিজাম বেঁকে বসলেন। তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন লায়েক আলী, কাসিম রাজভী ও মৈন নওয়াজ জং। আইনের ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন ওয়াল্টার মঙ্কটন।

শুধু নিজাম নয়, দেশ স্বাধীন হবার আগে ভারত সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন আরো কয়েক জন রাজা-মহারাজা। সাংবাদিক মহলে এক গুজব রটেছিল যে, জিন্না মহারাজাদের কাছে এক প্রস্তাব করেছেন পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্যে। তাঁদের নাকি তিনি বলেছেন যে, তাঁরা যদি পাকিস্তানে যোগ দেন তবে তাঁদের স্বাধীনতা অটুট থাকবে। ভারতের সঙ্গে যোগ দিলে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ হবার সম্ভাবনা আছে এ কথাটা জানাতে তিনি ভোলেন নি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জিন্নার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার জন্যে চতুর্দিকে দূত পাঠানো হলো। দিল্লীতে কোন এক মহারাণী সাহেবা এলেন, ব্যাপারটা অনুসন্ধান

করতে। তাঁরই এক বন্ধু ছিলেন জিন্নার বন্ধু। তাঁর সঙ্গে তিনি কথাবার্তা চালালেন।

কিন্তু গোল বাধালেন এক মহারাজা—। তাঁর শিরা-উপশিরায় আছে মহারাণা প্রতাপের রক্ত। খবরটা শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। অথচ তাঁকে না হলে এই প্রস্তাব কার্যকরী হবে না। মহারাজা স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমায় নির্দেশ দিয়ে গেছেন আমার পুর্বপুরুষ মহারাণা প্রতাপ। আমি তাঁরই আদেশ মেনে চলবো।'

মহারাজার এই তেজস্বিতা অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের ভীত করে তুললো। মহারাজা ভারতের সংগে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে জিন্নার এই অভিসন্ধির খবর সর্দার প্যাটেলের কানে পৌঁছল। তিনি জিন্নার উদ্দেশ্য বানচাল করে দিলেন। যাঁরা প্রথমে একটু গোলমাল করে-ছিলেন, তাঁরা হঠাৎ একদিন সবাই মিলে ভারতের সঙ্গে যোগ দিলেন।

সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলি যোগ দিল সত্য, কিন্তু নিজামের মনো-ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। কথাবার্তা চালাবার জন্যে ভারত সরকার প্রথমে ঠিক করলেন হায়দ্রাবাদে ভি, পি, মেননকে পাঠাবেন। কিন্তু বাধা দিলেন নিজাম। বললেন, মেননের হায়দ্রাবাদে উপস্থিতি অনেক বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিজামের প্রতিনিধি হয়ে মঙ্কটন গেলেন দিল্লীতে। মঙ্কটন প্রস্তাব করলেন একটা 'ষ্ট্যাণ্ডষ্টিল এগ্রিমেন্ট' করার। একটা খসড়াও সেই মর্মে তৈরী হলো।

মঙ্কটন হায়দ্রাবাদে ফিরে যেয়ে নিজামের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কাছে এই এগ্রিমেণ্টের খসড়া পেশ করলেন। প্রস্তাব সেইখানে পাশ হয়ে গেলো এবং নিজামও তাঁর সম্মতি দিলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই প্রস্তাবে তিনি সেই দিন সই করলেন না।

সেদিন শেষ রাত্রে, একদল রজাকার বাহিনী ওয়াল্টার মঙ্কটন, ছত্রীর নবাব ও স্যর সুলতান আহমেদের বাড়ী ঘেরাও করে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে। এর উদ্যোক্তা ছিলো কাসিম রাজভী ও লায়েক আলী। লাউড স্পীকার লাগিয়ে চীৎকার করে বলা হলো, 'ভারত সরকারের সঙ্গে কোন মীমাংসা চাই না।' স্যর সুলতান, মঙ্কটন, ছত্রীর নবাব আপ্রাণ চেষ্টা করলেন পুলিশকে ডাকবার, কিন্তু থানা থেকে কোন জবাব পাওয়া গেলো না। ভোর পাঁচটার একটু পরে ছত্রীর নবাবের অনুরোধে মিলিটারী এসে তাঁদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেলো।

এই ঘটনার পর নিজাম 'ষ্ট্যাণ্ডষ্টিল এগ্রিমেণ্টে' সই করতে আপত্তি করলেন। বোঝা গেলো, রাজভীর প্রভাব নিজামের উপর বিস্তার লাভ করেছে। বিরক্ত হয়ে মঙ্কটন জানালেন নিজামকে, 'আপনার অর্থই আপনার সর্বনাশ করবে।'

পরদিন নিজাম ভারত সরকারকে জানালেন যে হায়দ্রাবাদে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য আর এক নতুন ডেলিগেশন দিল্লীতে যাবে কথাবার্তা চালাবার জন্যে।

কিন্তু এবারও তাঁদের আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হলো।

এমনিভাবে দিনের পর দিন নিজাম মীমাংসা স্থগিত করে রাখলেন।

ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে অবস্থার ভয়ানক অবনতি ঘটলো। 'ষ্ট্যাণ্ডষ্টিল এগ্রিমেণ্ট' সই হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু দু'দলের মধ্যে সদ্ভাব হয়নি। এবার গোল বাধলো ভারতের প্রতিনিধি কে, এম, মুন্সীর বাড়ী নিয়ে। নিজাম তাঁকে পুরানো রেসিডেন্সীতে স্থান দিতে রাজী হলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধে ও-বাড়ী

মুন্সীকে ছেড়ে দিলেন। পাকিস্তানকে কুড়ি কোটি টাকা ধার দেয়ার ব্যাপার নিয়ে আর একটা হৈ-চৈ উঠলো।

অসকার বললে যে, অবস্থা এতো গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হায়দ্রাবাদ থেকে কোন খবরই আর বাইরে পাঠানো সম্ভব নয়। "বর্ডার এরিয়ায়" গোলমালও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, গোয়েন্দা সদা-সর্বদাই তার পেছনে লেগে আছে।

* * *

ফেরার পথে ওয়াদি ষ্টেশনে মালেয়ার সঙ্গে দেখা। ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমের এক প্রান্তে সে চুপ করে বসে আছে, চেহারাটা অনেকটা বাউণ্ডুলের মতো, গাল ভর্তি দাড়ি, দেখতে অনেকটা রজাকার নেতা কাসিম রাজভীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে চেনাই মুস্কিল। দেখে চীৎকার করে উঠলাম, 'মালেয়া, তুমি এখানে?'

মালেয়া দৌড়ে চলে এলো, তার পর চার দিক তাকিয়ে অতি সন্তর্পণে বললো, 'আস্তে—আস্তে, আই অ্যাম্ সাস্‌পেক্টেড।'

কথাটা শুনে বিস্মিত হ'লাম। মালেয়া ওয়েটিং-রুমের এক প্রান্তে নিয়ে গেলো, বললো, 'আর বলো না, বড়ো বিপদে পড়েছি। এডিটার পাঠিয়ে-ছিলেন হায়দ্রাবাদের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে। এখন দেখছি প্রাণ নিয়ে টানাটানি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটি কি খুলেই বলো না।'

মালেয়া বললে, আর বলো কেন ভাই! একদিন দেখি, আবিদ রোডের এক মাথায় বেশ ভীড় দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাপারটি কি জানতে এগিয়ে গেলাম। দেখি একটা গোয়ানিজ মেয়ে কাঁদছে, আর ওকে ঘিরে সবাই তামাসা দেখছে। পাশের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী? লোকটা জবাব দিলে 'রজারিক হ্যাজ বিটিন হার'।

শুনে চমকে উঠলাম। রজাকার মেরেছে শুনে আর চুপ থাকতে পারলাম না, তক্ষুনি যেয়ে লিখে ফেললাম 'থাউজেণ্ড ওয়ার্ডের কলারফুল ডেস্‌প্যাচ'। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, অসহায় নারীর প্রতি রজাকারদের অত্যাচারের কাহিনী। খবর পড়ে নিজাম সরকার রেগে কাঁই হয়ে উঠলেন। আমার অজ্ঞাতে আমার ঘরে বাক্স-পেঁটরা খানাতল্লাসীও হয়ে গেলো। হদিস্‌ পেলাম রজাকারেরা আমার খোঁজ করেছে। পরে খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে আমার খবরটার মধ্যে একটা ভুল ছিল। 'রজারিক হ্যাজ বিটিন হার' মানে নয় রজাকারেরা তাকে মেরেছে। রজারিক হচ্ছে মেয়েটির স্বামীর নাম। দুটো নামের সাদৃশ্য থাকায় এই বিভ্রাট। তাই পুলিসকে এড়াবার জন্যে এই ছদ্মবেশ।'

কিছুক্ষণ বাদে বোম্বাই অভিমুখী মাদ্রাজ মেল এসে পৌঁছল। মালেয়া ও আমি একটা খালি কামরায় উঠে বসলাম। সেখানে বসে মালেয়া বললো হায়দ্রাবাদের গল্প। বললে, 'ভারত সরকারের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও নিজাম কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিতে বা হায়দ্রাবাদে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে রাজি ন'ন। এ ছাড়া কাসিম রাজভীর প্রতাপ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে আজকাল রাজভীই দেশের শাসনকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

মালেয়া রাজভীর জেহাদ ঘোষণার বক্তৃতার কাহিনী বললে। মালেয়া সেই মিটিংএ উপস্থিত ছিল। বললে, 'এক বিরাট রজাকার বাহিনীর কুচকাওয়াজের পর রাজভী এক গরম বক্তৃতা দেয়। সেখানে সে দাবী করে মাদ্রাজের এক অংশ। শুধু তাই নয়, দম্ভ করে রাজভী বলেছিল যে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গোপসাগরের জল এসে নিজামের পা ধুইয়ে যাবে।'

মালেয়া বললে যে রিপোর্টের প্রতি অংশ অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। সে নিজের কানে এই বক্তৃতা শুনেছে, কাজেই রিপোর্টকে মিথ্যা বলা ভুল। ('লণ্ডন টাইমস্'এর রিপোর্টার এরিক ব্রিটার এই রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মাউন্টব্যাটেনের প্রেস এটাশে আলান ক্যাম্পবেল জনসনকে তিনি বলেছিলেন যে তিনি এই রজাকার প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি থাকাকালীন পর্যন্ত রাজভী কোন গরম বক্তৃতা দেয়নি।

*   *   *

বোম্বেতে ফিরে এসে শুনতে পেলাম যে মাউন্টব্যাটেন হায়দ্রাবাদ সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারেননি। মীর লায়েক আলীর সঙ্গে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর তিনি এক প্রস্তাব করলেন। এতে বলা হলো, রাজভীকে দমন করতে হবে এবং রজাকার অনুষ্ঠিত মিটিং, জলসা ও বক্তৃতা বন্ধ রাখতে হবে। হায়দ্রাবাদ ষ্টেট কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নতুন দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু তাই নয়, বৎসরান্তে নতুন কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লী হবে প্রতিষ্ঠা। স্থির হলো যে, নিজাম এক ঘোষণা করবেন এবং এতে এই সব প্রস্তাবগুলো মেনে নেয়া হবে। কিন্তু যখন ঘোষণা প্রকাশ পেলো তখন দেখতে পাওয়া গেলো যে, এই প্রস্তাবের কোন উল্লেখ নেই। ভারত সরকার এতে ক্ষুব্ধ হলেন। এর মধ্যে রজাকার বাহিনী মীর লায়েক আলীর উপর রেগে গেলো। গুজব রটলো যে লায়েক আলীর প্রতি তাঁদের আর কোন আস্থা নেই, কারণ তাঁরা সন্দেহ করছে যে লায়েক আলী ভারতের সঙ্গে মীমাংসা করতে চায়। লায়েক আলী ধুরন্ধর, বিপদ বুঝে সে রাজভীর সঙ্গে একটা আপোষ করে ফেললো।

বার বার ভারত সরকারের মীমাংসার প্রস্তাব নিজাম অগ্রাহ্য করলেন। নানা কৌশলে তিনি সময় কাটাতে লাগলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন নেহেরু ও প্যাটেল। দিল্লীতে নেহেরু লায়েক আলীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন। প্যাটেল স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে হায়দ্রাবাদকে বিনা সর্তে ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

জুন মাসের মাঝামাঝি অস্‌কার টেলীফোন করলে যে ভারত-হায়দ্রাবাদ কথাবার্তা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। পনেরোই জুন বিকেলে দিল্লী থেকে খবর এলো মাউণ্টব্যাটেন হায়দ্রাবাদ ডেলিগেশনের সঙ্গে দেখা করেছেন। কথাবার্তার পর এক খসড়া তৈরী হলো, প্রতিশ্রুতি দিলে লায়েক আলী যে বিকেল পাঁচটার সময় হায়দ্রাবাদ সরকার পাকা কথা দেবেন। কিন্তু কোন জবাব এলো না। ষোলোই জুন অস্‌কার জানালে যে, গুজব নিজাম ভারত সরকারের প্রস্তাব মানতে রাজী হ'ননি। সতেরোই তারিখ সরকারী ভাবে জানা গেলো যে আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে।

প্রেস কনফারেন্সে নেহেরু এই কথা জানালেন। আড়াই মাস বাদে হায়দ্রাবাদে' পুলিশ য়্যাক্‌শন' স্থুরু হলো।

হায়দ্রাবাদ ঘটনার কিছুদিন পরে পাশের ঘরের চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমার থাকবার জায়গাটা বারোয়ারী, বোম্বাই শহরে বাঙ্গালীদের প্রধান আশ্রয়। বিভিন্ন জাতির মিলন এখানে হয়নি সত্য কিন্তু বিচিত্র প্রকৃতির মানবের সমাবেশ এখানে হয়েছে। এখানকার বৈচিত্র্য এই যে, আহারের কথা স্মরণ হলে নিদ্রা ভুলতে

হয়, অথচ নিদ্রার কথা মনে হলে আহার হয় না। সহ-বাসের জন্য কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র তিনখানা খাটই পেতেছেন বই নয়, কক্ষের চতুর্দিকে বিভিন্ন জীবেরও স্থান করে দিয়েছেন। এই সব জীবদের সঙ্গে মিলনের একমাত্র সময় ছিল গভীর রাত্রে। যখন এরা দর্শন দিতেন তখন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিতাম।

আমার পাশের ঘরে থাকতেন সুকুমারবাবু। পেশা—সরকারী দপ্তরে কেরাণী বৃত্তি। নেশা—প্রভাতে দেব-দেবীর স্মরণ, ও বিকালে পলিটিক্স আলোচনা। সুযোগ ও সুবিধা পেলে হোটেলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণার পরামর্শ সর্বদাই দিয়ে থাকেন।

সুকুমারবাবু কবে, কি কারণে বোম্বাই সহরে আগমন করেছিলেন জানা নেই। মালিকের কাছে তাঁর আগমন নিতান্ত বিষাদেরই ব্যাপার। কারণ তিনি এখনও সাবেকী প্রথায় চলেন ও পুরানো রেটে হোটেলের দেনা-পাওনা শোধ করেন। শুধু তাই নয়, আহার-নিদ্রা ব্যাপারে তাঁর সাবেকী বিশেষত্ব বজায় আছে।

ভোরবেলার কলহের হেতু চাকরের মুখে শুনতে পেলাম। কিছুদিন আগে কলকাতার স্কুলগুলোতে ম্যাট্রিক টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। সাধারণতঃ টেষ্ট পরীক্ষার পর, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনালের শেষে বাংলার বহু উদীয়মান তরুণ বোম্বাই শহরে তীর্থযাত্রা করেন। কারণটা অবশ্য বলা বাহুল্য। পরীক্ষা, বিশেষ করে, অঙ্কের পেপারটা ভালো হয়নি, তাই তরুণ চিত্র-তারকার দল আত্মীয়-স্বজনদের অজ্ঞাতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন আমাদের বারোয়ারী আড্ডায়। উদ্দেশ্য—ফিল্মষ্টার হবেন।

একদিন সুপ্রভাতে এক তরুণ অভিনেতার আগমন হলো সুকুমার বাবুর ঘরে। সুকুমারবাবু যখন আহ্নিকে মগ্ন, তখন তরুণ বন্ধুটি জানতে চাইলেন অশোককুমার, দেবীকারাণীর বাড়ীর ঠিকানা। প্রশ্নটা শুনে সুকুমারবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'ডেঁপো ছোক্‌রা, দেখতে পাচ্ছো না যে পূজো-আহ্নিক করছি?'

'ছাই করছেন,' তরুণ বন্ধুটি জবাব দেয়, 'আপনার দেয়ালে টাঙ্গানো আছে ডরোথী ল্যামুরের ছবি। একদৃষ্টে তাকিয়ে তো আছেন ঐ দিকে।'

জবাব শুনে বোমার মতো ফেটে পড়েন সুকুমারবাবু। এমনি জবাব তাঁকে কোনদিন শুনতে হয়নি এই মেসে। তাই বলেন, 'কী বললে, আমি তোমার বাবার বয়সী, তুমি কিনা আমায় যাচ্ছে-তাই করে অপমান করছো, বেরোও আমার ঘর থেকে।'

ভদ্রলোক সর্বপ্রথম তাঁর বার্দ্ধক্যের কথা স্বীকার করলেন। সচরাচর তিনি ওটাকে পঁয়ত্রিশের নিচে বলেই জাহির করেন কিন্তু আজ রাগের মুখে সত্য কথাটা স্বীকার করলেন।

পরে এই কলহ মেটাবার জন্য মেসে এক পঞ্চায়েৎ বসলো। তার সভাপতি হলাম আমি। সেই সূত্রে তরুণ বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় হলো। সমস্ত গোলমাল মিটে যাবার পর হৃদ্যতাও হলো একটুখানি। ছেলেটির নাম ধীরেন। টেষ্ট পরীক্ষার দুর্ঘটনাই তার বোম্বাই আসার একমাত্র কারণ নয়। তাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে চিনুও আংশিক কারণ বলতে হবে। চিনুও ম্যাট্রিকের পরিক্ষার্থিনী। টেষ্ট পেপারের আদান-প্রদানের দরুণ এদের সম্পর্ক ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দু'পক্ষেরই পিতৃপক্ষ খবরটা জানতে পেরে বিপদ ঘটালেন ধীরেন-চিনুর দেখা-সাক্ষাৎ একদম বন্ধ হয়ে গেলো।

একদিন সন্ধ্যায় তাদের শেষ দেখা হলো দেশপ্রিয় পার্কে। দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করলে যে ভবিষ্যতে তাদের মিলন বাঞ্ছনীয়, তবে মিলনের তারিখটা বর্তমানে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রাখা হলো। এ খবরের কিছুটা আভাষ পেলেন চিনুর বাবা-মা। তাই তাড়াহুড়ো করে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন অন্য এক ছেলের সঙ্গে। টেষ্ট পরীক্ষার আগেই চিনুর বিয়ে হয়ে গেলো।

দেশপ্রিয় পার্কের সেই সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে ধীরেনের মন নারী জাতির প্রতি বিদ্বেষে ভরে উঠলো। তাই বিয়ের দিন চিনুর ছোট বোনকে ডেকে বলেছিল যে তোর দিদিকে বলিস যে আমি দেবদাস হয়ে যাচ্ছি। জবাবে চিনু জানিয়েছিল যে ধীরেন যদি দেবদাস হয় তবে তার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, তবে চিনুর পক্ষে পার্বতী হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

বোম্বে আসার জন্য ধীরেন এক মাসের পাথেয়ও সংগ্রহ করে এনেছিল। তাই মাস শেষে যখন পুঁজি নিঃশেষিত হয়ে এলো তখন তার উৎসাহ অনেকটা কমে গেলো। বহু ষ্টুডিওতে সে ধর্ণা দিয়েছে কিন্তু কেউ বড়ো তাঁকে আমল দেয়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভাগ্যের পরিবর্তন হলো। এক নতুন ফিল্ম কোম্পানী থেকে তার ডাক এলো। একটা ছবিতে তাকে রাখাল বালকের অংশ দেয়া হয়েছে।

এই ফিল্ম কোম্পানীর কোন নিজস্ব ষ্টুডিও নেই, লামিংটন রোডে একটা ছোট ঘর ভাড়া করে অফিস করা হয়েছে। মালিক কাপড়ের ব্যবসাদার। হঠাৎ একদিন রাধা-কৃষ্ণের ছবি দেখে চিত্রের হিরোইনকে ধন্যবাদ জানাতে দাদারের ষ্টুডিওতে গিয়েছিলেন। তবে দ্বারপ্রান্ত থেকেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল, কারণ শেঠজীর প্রবেশাধিকার মেলেনি। সেই দিনই তিনি স্থির করলেন

যে এক ফিল্ম কোম্পানী খুলবেন। কারণ শেঠজী প্রতিজ্ঞা করলেন যে যারা তাঁকে ষ্টুডিওর দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের তিনি গোলাম করে রাখবেন আর যে নায়িকাকে তিনি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়েছিলেন তিনি হবেন তাঁর মাইনে করা চাকরাণী।

শেঠজী তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখলেন। সেই ষ্টুডিওর সবাইকে তিনি ডবল মাইনে দিয়ে নিয়ে এলেন। সহকারী ডাইরেক্টরকে প্রমোশান্ দেওয়া হলো ডাইরেক্টরের পদে।

ছ'মাস ধরে ছবির মহড়া চললো। ছবির বিষয়বস্তু ধর্মমূলক। শেঠজী ধর্মভীরু লোক, ব্যবসায়ে যেটুকু পাপ অর্জন করেন সেটাকে স্খালন করতে চান পৌরাণিক বিষয়বস্তুর উপর ছবি তুলে। তাই কোম্পানীর প্রথম অবদান হলো মহাভারতের এক কাহিনী।

ধীরেনের শেঠজীর সঙ্গে পরিচয় হবার কারণ ছিল। দু'জনে একই সঙ্গে দ্বারপ্রান্ত থেকে বিতাড়িত হবার দরুণ একটা সৌহার্দ্য জন্মেছিল। শেঠজীর অনুরোধে ডাইরেক্টর ধীরেনকে একটা ছোট পার্ট দিয়েছিলেন।

ধীরেন শুটিং-এর দিনে অনুরোধ করলে তার সঙ্গে যাবার জন্যে। বললে, 'চলুন না, আমার এক্‌টিং একবার দেখে আসবেন।'

শুটিং দেখবার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি, তাই ধীরেনের প্রস্তাবে রাজী হলাম। ষ্টুডিও আন্ধেরীতে। ষ্টেশন থেকে একটু হেঁটে যেতে হয়। তবে শুটিং বাইরেই হচ্ছিলো, তাই দেখবার কোন অসুবিধা হলো না।

দু'-একটা শট নেবার পর দর্শন মিললো শেঠজীর। তিনি এসে ডাইরেক্টরকে ধম্‌কালেন। কেন তাঁর আসার পূর্বেই ছবির শুটিং আরম্ভ হয়েছে ইত্যাদি। ডাইরেক্টর তার প্রমোশানের কথা স্মরণ

করে জবাব দিলে। বললে, ষ্টুডিওর সমস্ত সরঞ্জাম ভাড়া করা। প্রতি ঘণ্টার জন্য তাকে পয়সা দিতে হচ্ছে। শেঠজীর জন্য এক ঘণ্টা প্রতীক্ষায় থেকে সে তার কাজ সুরু করেছে।

শেঠজী সুখী হলেন কি দুঃখিত হলেন বোঝা গেলো না, তবে একটু চিন্তার পর হুকুম দিলেন যে শটগুলো আবার 'টেক' করা হোক।

আদেশ অমান্য করলে ডাইরেক্টরের আবার সহকারীর পদে নেমে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই তিনি রাজী হলেন। প্রথম দৃশ্য হিরোর মৃত্যু, হিরোইন শোকে কাঁদছে।

অভিনয় সুরু হবার পাঁচ মিনিট বাদে শেঠজী চীৎকার করে উঠলেন। হিরোইনকে কাঁদতে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আরে ডাইরেক্টর সাহেব, ইত্‌নি খুপসুরৎ আউরাৎ রোতী কিউ।'

ডাইরেক্টার কারণটা বাতলালে, কিন্তু সেটা শেঠজীর পছন্দসই হলো না। বললেন, 'রোণা নেহি চাহিয়ে। দো-চার, গানা-বাজনা লাগা দেও।'

অনন্যোপায় হয়ে ডাইরেক্টর হিরোইনকে হুকুম দিলে কান্না বন্ধ করে গান গাইতে। গান সুরু হলো।

এর পরের দৃশ্যে শেঠজী আবার আপত্তি তুললেন। হিরোইনের পরিধানে নিতান্ত সাধারণ শাড়ী দেখে তিনি হুকুম দিলেন যে তাকে কোন জমকালো শাড়ী পরানো হোক।

ডাইরেক্টর আপত্তি তুললে। চটে গেলেন শেঠজী, বললেন, 'পয়সা তেরা হ্যাঁয় কি মেরা? যাও আভি মেরা দোকানসে এক জর্জেট শাড়ী খরিদো আর ইন্‌কো পহনাও।'

অতএব পরের দৃশ্যে হিরোইন জর্জেট শাড়ী পরে তার অভিনয় সুরু করলে। কিন্তু এতেও শেঠজী খুসী হলেন না, কারণ এক দৃশ্যে

তিনি দেখতে পেলেন যে হিরো-হিরোইন হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। অমনি তিনি হুকুম দিলেন, 'আরে ইয়ে কেয়া বাত? হিরোকী তো কভি হিরোইনকী হাত নেহী ছুনা চাহিয়ে, দোনাকো আলগ্ রহেনে দেও।'

অতএব হিরো-হিরোইন যতোদূর সম্ভব ব্যবধান রেখে অভিনয় করতে লাগলো।

এর পরে শেঠজী হুকুম দিলেন যে তাঁর চণ্ডীদাসের দুটো গান এবং ঝুলার দুটো গান ভালো লেগেছিল। কাজেই ও-ধরণের দু'তিনটা গান যেন এ ছবিতে রাখা হয়। আর প্রথম দৃশ্য তার ভালো লেগেছে অতএব ওটা যেন দুবার দেখান হয়।

অনেক পরামর্শ দিয়ে শেঠজী ক্লান্ত বোধ করলেন। তাই ছবির শুটিং স্থগিত রাখার আদেশ দিয়ে তিনি তাঁর ক্রফোর্ড মার্কেটের দোকানে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন যে বাজার মন্দা যাচ্ছে, যদি 'নাফা যাদা' না হয় তবে ছবি তোলা বন্ধ করে দিতে হতে পারে।

এই ছবি শেষ পর্যন্ত বাজারে বেরিয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

* * *

ফেরার পথে আহারের সন্ধানে পুরোহিতের হোটেলে এসে উপস্থিত হলাম। দ্বারপ্রান্তে দেশাইর সঙ্গে দেখা। দেশাই একটা কাগজের ক্রাইম রিপোর্টার। দেশাই জানালে, 'শুনেছো, এক বিরাট মার্ডার হয়েছে? এক ফিল্ম একট্রেস ইনভলবড্। আমি যাচ্ছি খবর আনতে, ওখানে যাবে নাকি?'

ঘটনাটা ঘটেছিল একটু দূরেই; ম্যারিণ ড্রাইভের এক বাড়ীতে। কাজেই যেতে আপত্তি করলাম না।

বাড়ীতে বেশ ভীড় হয়েছিল। পুলিশ ইন্‌সপেক্টর পরিচিত, কাজেই তাঁর কাছ থেকে ঘটনার একটা বিবরণ পেলাম। তিনি জানালেন যে মার্ডার নয়, আত্মহত্যা। কারণটা এখনও জানা যায়নি।

ইন্‌সপেক্টর হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বাঙ্গালী? মেয়েটাও যে বাঙ্গালী! মাত্র সাত-আট মাস আগে এখানে এসেছিল। নাম অলোকানন্দা। চেনেন কি?'

* * *

শেষ

অলোকানন্দার আত্মহত্যাই এ কাহিনীর এপিলোগ। তার আত্মহত্যার কারণ আজও জান্‌তে পারিনি এবং জানবার চেষ্টাও করিনি।

এর পরে বহু জায়গায় রিপোর্টার হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছি, বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু সে সব চরিত্র আজ আমার মনে নেই। কিন্তু অজয়, অলোকা, আচার্য, মাসীমা, ব্রজানন্দবাবু ও ধীরেনকে আমার আজও মনে আছে।

কিছুদিন আগে এক ডিনার-টেবিলে বসে এই কাহিনীটা কয়েক জনকে বলেছিলাম। এদের মধ্যে দুটি মেয়ে ছিলেন। আমার বিবরণী শুনে একজন বললেন, 'সবই ঠিক আছে কিন্তু অলোকার চরিত্রটা বড্ডো 'আননেচারাল'। বিয়ের আগে অনেক মেয়েই প্রেমে পড়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো তার প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে হয় না কিন্তু সেই জন্যে এমনি ভাবে কেউ বখে যায় না। নিজের ঘর-সংসার হলে সবাই পুরানো কথা ভুলে যায়।'

ভদ্রমহিলার স্বামী মন্তব্য করেছিলেন, 'দ্যাখো, ছেলে বখলে তাকে সামলানো যায় কিন্তু মেয়ে বখে গেলে তাকে বাগ মানানো মুস্কিল।'

ডিনারের শেষে অন্য মেয়েটি এসে বলেছিলেন, 'আশ্চর্য! আমি বিশ্বাস করি নে যে অলোকা বখে গিয়েছিল। আমার মনে হয় যে ওর প্রেম ছিল গভীর, তাই ওর এই পরিণতি হয়েছিল!' তারপর একটু চুপ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ঠিক করে বলুন তো, সত্যই কী অলোকা বলে কোন মেয়ে ছিল?'

জবাব দিয়েছিলাম—'দেখুন, এ কাহিনীর মধ্যে রূপও আছে, কথাও আছে, তবে সম্পূর্ণটা যে রূপকথা নয় এ আমি হলপ করেই বলতে পারি।'

মেয়েটি জবাব দেয়,—'না, বিশ্বাস করেছি বলেই এই প্রশ্ন করছি। বাংলা দেশে অলোকার অভাব হবে না একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। ওর মতো বহু মেয়ে আছে যারা তাদের পুরানো প্রেমকে আজও ভুলতে পারেনি।'—বল্‌তে বল্‌তে মেয়েটির চোখ সজল হয়ে এলো। তিনি কোন রকমে কথা শেষ করে চলে গেলেন।

আচার্যির কোন খবরই জানি না। তবে অলোকার আত্মহত্যার কিছুদিন পরে ওর একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে লিখেছিল—'চাকুরী ছেড়ে দিচ্ছি, কোন একটা বড়ো বা মহৎ কিছু করার উদ্দেশে নয়। অজয়ের মৃত্যুর পর আমার সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশা-আগ্রহ চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গিয়েছে। ছুটী নিয়ে চার-পাঁচ বার এদিক-ওদিক চেঞ্জে গিয়েছি কিন্তু কোথাও তৃপ্তি পাইনি। সর্বদাই মনে হয়েছে নিজেকে প্রবঞ্চনা করছি। চিঠি পড়ে হয়তো ভাবছেন যে ফিলসফার হয়ে গেছি। না, তা হইনি, যদি হতে পারতাম তবে

হয়তো এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতাম কিন্তু পারিনি বলেই আজ আমায় এই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দগ্ধ করছে। পরোপকার করার মতো মহৎ উদ্দেশ্য আমার নেই, ওটা দেশের পলিটিসিয়ানদের জন্যে তুলে রেখেছি। আমি কারো দুঃখ লাঘব করতে চাই না, আমি নিজে বরণ করে নিতে চাই দুঃখকে। কিছুদিন আগে বিহারের পশ্চিম প্রান্তে যোগবাণীতে গিয়েছিলেম। সামনেই হিমালয়, বড়ো নির্জন। আর লোকগুলো বড়ো ভালো। এরা মন খুলে কথা বলে। তাই ঠিক করেছি ওখানে যেয়ে আস্তানা গাড়বো। নিজের সংস্থানের জন্যে একটা টী ষ্টল দেবার ইচ্ছে আছে। যদি কখনও ওদিকে আসেন তবে একবার দর্শন দেবেন—ইতি আচার্য।'

মাসীমার সঙ্গে কলকাতার শেয়ালদ ষ্টেশনে হঠাৎ একদিন দেখা হয়েছিল। নৈহাটী থেকে আসছিলাম, হঠাৎ দেখি ষ্টেশনের বাইরের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মাসীমা। আমায় দেখে তিনি খুসীই হলেন। বললেন, 'কাল প্লেনে এসেছি দিল্লী থেকে। ভাবছি এই সব শরণার্থীদের জন্য একটা রিলিফের বন্দোবস্ত করবো। হ্যাঁ, ভালো কথা, দিল্লীর সবাই তোমার খোঁজ করছিল।'

সামনেই মাসীমার বিরাট ব্যুইক গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। মাসীমা এক রকম প্রায় জোর করেই তাঁর গাড়ীতে নিয়ে বসালেন। তার পর বলতে লাগলেন এই সব শরণার্থীদের কথা: 'ওঃ, এদের এই জীবন আমায় যে কি দুঃখ দিয়েছে তা তোমায় কি বলবো? আমি কখন এদের এই জীবনধারা চিন্তা করতে পারি নে।'—বলতে-বলতে মাসীমা দু'-তিন বার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সিল্কের রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। তারপর বললেন, 'ভাগ্যিস ক্যামেরাটা নিয়ে

এসেছিলাম। এদের এই 'লাইফের' কতোগুলো ছবি নিয়েছি। দিল্লীর ওরা দেখলে বড্ডো ইমপ্রেস্‌ড হবে।'

লেক মার্কেটের কাছে আমি নেমে গেলাম। যাবার আগে মাসিমা বললেন, 'পারো ত এসো একদিন। একটা পাব্লিসিটির বন্দোবস্ত তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই করা যাবে।'

শুনেছি ব্রজানন্দ বাবু এখনও বোম্বাইতে আছেন। তবে ধর্মের কাজের সঙ্গে-সঙ্গে এখন একটু ব্যবসায় ঝোঁক দিয়েছেন। তাঁর এই পরিবর্তন দেখে একজন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'পাগল, আর কি? আমি কি আর নিজে ব্যবসা করি? করুণাসিন্ধু আমার একান্ত অনুগত লোক। এসে বললে, কিছু টাকা দিন, ব্যবসা করবো। বখেরা আধা-আধি।'

পরিচিত ভদ্রলোকটি বললেন, 'ব্যবসা যে পাপ কাজ ব্রজানন্দবাবু!'

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'আমি কি আর সে কথা জানি না। সেটাও ভাগ করে নিয়েছি। ব্যবসা তো করে করুণাসিন্ধু কাজেই পাপের ভাগটা ওর, আমি টাকা দিয়েছি কাজেই পুণ্যের ভাগটা ন্যায্যতঃ আমার প্রাপ্য।'

* * *

পরিশেষে অজয় সম্বন্ধে একটা কথা বলার আছে। অজয়ের জীবনের এই পরিবর্তন আমায় বিস্মিত করেছিল। সত্যিই কি ও মৃত্যুর ভয়ে অলোকাকে বিয়ে করেনি, না ওটা অলোকাকে এড়িয়ে যাবার অছিলা মাত্র।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে অজয় অলোকাকে ভালবাসতো না। অলোকাকে প্রবঞ্চনা করার কোন উদ্দেশ্যই ওর ছিল না, আর

গভীর ভালোবাসা ছিল বলেই ও বিয়ে করতে দ্বিধা বোধ করেছিল। কারণ অলোকার জীবনকে ও কখনও দুঃখময় করে তুল্‌তে চায়নি। অজয় মৃত্যুর আশংকা করেছিল, তাই চায়নি বিবাহের বন্ধনে আট্‌কা পড়তে।

কিন্তু অজয় কেন মৃত্যুর আশংকা করেছিল? এটা আমার কাছে অনেকটা কুহেলিকার মতো মনে হয়েছিল। কারণ ছেলেবেলায় কখনো ও কোন কিছুকে ভয় পায়নি, মরবার ভয় ওর ছিল না। হাসি, ঠাট্টা, হৈ-চৈ করাই ছিল ওর চরিত্রের সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ। মৃত্যুর কথা কেউ যদি কখনো বলতো তবে ও বিদ্রূপ করে জবাব দিতো…

'When the Last Trumpet sounds, and we are couched in our porphyry tombs, I shall turn and whisper to you, 'my friends, let us pretend, we do not hear it'.'

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	বারেটা	বারোটা
৩	১৮	বৈঠকে	বৈঠক
৫	১৬	love heaven	love of heaven
১৩	৩	অংহিসসেবী	অহিংসসেবী
৪৮	১	দেরুদাসপুর	গুরুদাসপুর
৬১	৩	নিজের	নিডোর
৬৯	১৭	চব্বিশে	পঁচিশে
৮৬	৬	দিল্লী সমাজের	এরা দিল্লী সমাজের
১৩৭	১	for me. I	for me if I